তারাশঙ্করের জীবনদর্শন : উৎস ও স্বরূপ

ভীষ্মদেব চৌধুরী

প্রাথমিক চেতনা – উৎস

ক্ষীয়মাণ সামন্তসমাজের এক ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) জন্ম। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন' কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত-পরবর্তী দশকে ব্রিটিশ বাণিজ্য-পুঁজির সচল ভূমিকা সমাজকাঠামোর গুণগত পরিবর্তনকে করেছে ত্বরান্বিত। ভূমি বন্দোবস্তের ঐ চিরস্থায়ী -আইন প্রধানত ব্রিটিশ বাণিজ্য-পুঁজির আশীর্বাদ-ধন্য নব্য ধনিক-সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই সুদৃঢ়বদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের সমাজে সামন্ত-মধ্যযুগ থেকে প্রাক্-ধনতন্ত্রী আধুনিক-যুগে উত্তরণের এই সংক্রান্তি-পর্ব, ক্ষয়িষ্ণু বনেদি জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে বাণিজ্য-পুঁজির আনুকূল্যে নবজাত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মুখর। এর একদিকে সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতির পরাভবজাত মর্মান্তিক বেদনা, অন্যদিকে নবলব্ধ অর্থকৌলীন্যের দৌরাত্ম্যে সমাজ-সংসার-জীবনকে অধিগত করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।[১] বিপরীতমুখী এই দুই স্রোতের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যে-শ্রেণী তারই উত্তরপুরুষ তারাশঙ্কর। একদিকে পরিবার-জীবনে শ্রেণীগত উত্তরাধিকার লাভ, অন্যদিকে সমকালীন রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ এবং ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রভাব আত্মস্থ ক'রেই ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর তাঁর শিল্পিচৈতন্য ও সমাজবোধের সামবায়িক প্রেক্ষণবিন্দু থেকে সমাজের গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অর্থে তারাশঙ্কর পরিবর্তমান কালের দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সতর্ক দ্রষ্টা এবং এর শিল্পভাষ্য সৃজনের সাফল্যে মহান শিল্পী।

সমাজ-প্রতিবেশ

ক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্র সামন্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সূত্রে তারাশঙ্কর আজন্ম-আশৈশব সামন্ত-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করেছেন। তাঁর জন্মলগ্ন কালান্তরের সময়প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত এবং তারাশঙ্কর-চৈতন্য গঠনেও তা অমোঘভাবে থেকেছে সক্রিয়। বর্তমান ও অতীত— তারাশঙ্করের ভাষায় 'একাল' ও 'সেকাল'-এর এই মিথস্ক্রিয়ার প্রতিফল তারাশঙ্কর-মানসে আত্তীকৃত হওয়ার পশ্চাতে সময়ধর্ম

ও যুগধর্মের অনির্দেশ্য ও অবাধ্য অনুশাসন ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

... আমার মন সেকালকে—কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মত বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের পুতুল ব'লে মিউজিয়ামের বস্তু ব'লেও ভাবতে পারে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন কি আছে ! বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু। তেত্রিশ কোটি দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদী নির্মাল্য, অম্লান বিল্বপত্রের মত কিছু। আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না।'[২]

তারাশঙ্করের পারিবারিক পরিমণ্ডল, সামাজিক আবহ, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং জন্মভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—ব্যাপকার্থে তাঁর আর্থ-সামাজিক-প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দ্বন্দ্বময় বৈপরীত্যে প্রাণময়। এই সপ্রাণ অগ্রপট-পার্শ্বভূমি তথা সামগ্রিক প্রতিবেশ বিশ্লেষণের সাহায্যে তারাশঙ্কর-মানসের উৎসবিন্দু এবং ক্রমান্বয়ে অর্জিত সুস্থিত জীবনার্থের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ তথা ১৩০৫ বঙ্গাব্দের এক শ্রাবণ-প্রত্যুষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩] তাঁর জন্ম-বছরের সংক্ষুব্ধ সমাজ-প্রতিবেশ উত্তরকালে তারাশঙ্করের স্মৃতিচারণামূলক ভাষ্যে বিধৃত হয়েছে :

১৮৯৮ সাল। ভারতবর্ষের দিকে দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতেশ্বরী তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত— মহারাণীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায় –থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলে ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সবখানে সব কড়া ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে। প্রাচীন রাঢ় বরেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে।

১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। জমিদার প্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার-বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরও দুটি বংশ, ওই সরকার বাবুদেরই দৌহিত্র -বংশ।...ঠিক এই সময়ে— গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘরে থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্রি সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। ...আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট

হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম ...তাঁরা বলতেন 'মাটি বাপের নয়, দাপের; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবি ঘোষণা ক'রে বলতেন— 'আমি জমিদার।' এদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।...লাভপুর সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ (১০ : ৪০০-০২)

এই দ্বন্দ্বময় সামাজিক প্রতিবেশ দ্বারা লালিত হয়েছে তারাশঙ্করের শৈশব-কৈশোর-যৌবন। সমাজ অন্তঃস্থ শ্রেণীসমূহের এই পরস্পরিত সংঘাত সময়শাসিত সমাজচৈতন্যের গতিময়তারই পরিচায়ক। ঘড়িতে ঘন্টার কাঁটার আপাতস্থিরতার অভ্যন্তরে সচলতার যে অদৃশ্য গতিভঙ্গি ক্রিয়াশীল—তারই অনুরূপ অচলায়তন-সমাজের মধ্যকার এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সমাজের অনিবার্য অগ্রগতিরই দ্যোতক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই সমাজদ্বন্দ্বের এই টানাপোড়েনের অংশীদারিত্ব লাভ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি অনুধাবনীয় :

এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল। (১০ : ৪০৪)

আমরাও ছিলাম স্বল্প আয়ের জমিদার, পাখী-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্যতা না থাকলেও পাখা ছিল। সুতরাং আকাশের উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায় দুর্বল ডানায় ভর দিয়েও মেতে ওঠাই এ ক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক জীবনধর্ম। এ-ই স্বাভাবিক, জীবন-ধর্ম বলেই এই দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকেও স্পর্শ করেছিল। (১০ : ৪০৪)

শ্রেণীউত্থান ও শ্রেণীবিপর্যয়ের সংঘর্ষকালীন সময়ে বিপর্যস্ত-শ্রেণীর অংশী ও প্রতিভূ যিনি—তার অন্তস্তলস্থিত বাস্তবিক বেদনা জীবনধর্মেরই অকপট অভিব্যক্তি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-পরিবারের উত্তরাধিকারী -রূপে এই দ্বন্দ্ব ও তার

পরিণতি অনিবার্যভাবে তারাশঙ্করকে বেদনার্দ্র করেছে। স্ব-শ্রেণীর পরাভবের এই বাস্তবিক বেদনাকে তারাশঙ্কর 'জীবন-ধর্ম'-এর সমার্থকরূপে মূল্যায়ন করেছেন।

ভূ-প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল

বিশেষ জলবায়ূ-লালিত মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র ও মানসগঠনে ভূ-প্রকৃতির নিভৃত অথচ সুদৃঢ়বিদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। ভূ-প্রকৃতির স্থানিক বৈশিষ্ট্য সংবেদনশীল প্রতিভানশক্তির বিকাশ ও পরিচর্যায় পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যে -মৃত্তিকায় একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মৃত্তিকায় শেকড় প্রোথিত করেই ক্রমশ তাঁর শিল্পিচৈতন্যবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা-পত্র-পল্লব-পুষ্পে শোভিত হ'য়ে প্রাণবন্ত সত্তায় আবির্ভূত হয়।

লাভপুর তথা রাঢ়-বঙ্গের বীরভূম জেলার বালি-কাঁকর-মিশ্রিত গৈরিক মৃত্তিকার এবং রুদ্র প্রকৃতির দুই বিপরীতধর্মী প্রভাব-পরিচর্যার আশ্রয়ে তারাশঙ্কর -মানস পরিস্রুত। লাভপুরের রাঙামাটির পাথুরে কাঠিন্যের সঙ্গে প্রথম আলিঙ্গনের স্মৃতিচারণায় তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> ... বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে। মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙা মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তর-দুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে। ...ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে, শেষে গাঁইতি আনা হ'ল। দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে— তা আজও আমার চোখে ভাসছে। গাঁইতির একটা দিক ভোঁতা হয়েছিল, একটা দিক ভেঙেছিল। এরই নিচের তলা ধ'রে আমি প্রথম পৃথিবীর মৃত্তিকার আলিঙ্গন পেয়েছিলাম। (১০ : ৪৩১)

রাঢ় বঙ্গের তথা 'বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরই জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে একদিকে বর্ধমানের শস্যপূর্ণ আদিগন্ত প্রান্তর, অপরদিকে বীরভূম ও বাঁকুড়ার তরঙ্গময় কাঁকুরে রুক্ষতা, জীবনের দ্বৈতরূপকে এখানে যুগপৎ ধরে রেখেছে। কাজেই পিপাসার্ত বীরভূমের দুর্ভিক্ষ (ধাত্রী দেবতা) এবং দু-কূলপ্লাবী ময়ূরাক্ষী(গণদেবতা)-দুইই এ অঞ্চলের বিশেষত্ব।[৪] প্রকৃতির এই দ্বৈতরূপের মত বীরভূমবাসীর জীবনচর্যাও সমান্তরাল দুই স্রোতোধারায় প্রবাহিত। শক্তিসাধক শাক্তের বিপরীতে বিষ্ণু-উপাসক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, অবক্ষয়িত সামন্ত সমাজপতির প্রতিপক্ষে নবীন ধনপতির উত্থান, 'রাজভক্তির' পরাকাষ্ঠা এবং এর

প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মধারার বিস্তার, হঠাৎ-ধনীর উত্থানের বিপ্রতীপে বনেদি সামন্ত জমিদারের 'অস্তাচল যাত্রা'—সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক সর্বক্ষেত্রেই জীবনসাধনার এই দ্বৈতপথ ও রূপ রাঢ়বঙ্গের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যেরই অনুরূপ।[৫]

নদীবাহিত পলিমাটির তৈরি পূর্ববঙ্গের ভূখণ্ডের তুলনায় রাঢ়বঙ্গের কাঁকর-মিশ্রিত পাথুরে গৈরিক মৃত্তিকার সংগঠনবৈশিষ্ট্য ভিন্ন। রাঢ়বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ 'বৃষ্টিবায়ু ও হিমবাহ-বাহিত' মৃত্তিকায় প্রস্তুত। এজন্যেই বঙ্গদেশের 'প্রাচীনতম' এই ভূখণ্ডের সংগঠনের ইতিহাস ভূতাত্ত্বিক দিগন্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত।[৬] রাঢ়বঙ্গের এই রূঢ়-নিষ্ঠুর নিসর্গের কঠোরতার অভ্যন্তরে 'উদ্দাম ও গতিশীল' 'প্রাণপ্রবাহের নির্ঝর' প্রবাহিত। (১০ : ৪৭৫) এই অঞ্চলের নিসর্গ-বৈশিষ্ট্যের দ্বৈতরূপ বিনয় ঘোষ-এর সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও নিরূপিত হয়েছে :

> ... রাঢ়ের নিসর্গ রূঢ়। রূঢ়তার কন্দরে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের নির্ঝর, উদ্দাম ও গতিশীল। রূঢ়তার বহিরাবরণ ভেদ করে তবে এই নির্ঝরের উচ্ছ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছতে হয়। রাঙামাটি কাঁকরবালি আর ঝামা পাথরের মধ্যে মধ্যে সবুজের স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ। এই নিসর্গই জয়দেব-চণ্ডীদাসের মধুনিস্যন্দী কাব্যনির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করেছে, তান্ত্রিক পীঠস্থানে বুহ শাক্ত উপাসকের কঠোর শক্তি সাধনার মদিরা যুগিয়েছে এবং লোকায়ত সংস্কৃতির উষ্ণ প্রস্রবণটিকে যুগ যুগ ধরে সজীব করে রেখেছে।[৭]

রাঢ় বাংলার এই ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচর্যা ও আশ্রয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিমানস সংগঠিত হয়েছে। লাভপুরের যে -মৃত্তিকায় তারাশঙ্কব ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, আশৈশব তাঁর শিল্পী-চৈতন্যবৃক্ষ সেই মৃত্তিকায় শিকড় প্রোথিত করেই জীবনীশক্তির অনিবার্য রসশক্তি আহরণ করেছিলো।[৮] বীরভূমের নিসর্গজীবনের দ্বৈতরূপ— শাক্তের রূঢ় বলিষ্ঠতা আর বৈষ্ণবের ঔদার্য ও বিনয়ের[৯] সঙ্গে যার তুলনা করা যায়—সে -বৈশিষ্ট্য তারাশঙ্কর তাঁর শিল্পসাধনা ও জীবন সাধনায় আত্মস্থ করেছিলেন। দ্বন্দ্বময় যে সামাজিক-প্রতিবেশ উত্তরাধিকার সূত্রে তারাশঙ্কর অর্জন করেছেন, অভিন্ন অর্থে দ্বন্দ্বময় প্রকৃতির অদৃশ্য পরিচর্যাও তাঁর জীবনার্থ সন্ধান ও নিরূপণে সহায়ক হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সঙ্কুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তারাশঙ্কর প্রায়শ দ্বন্দ্বের অধিগত হয়েছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ ও প্রকৃতিমূল থেকে উত্থিত বাস্তবিক এই দ্বন্দ্বের শিল্পরূপায়ণে সাফল্যও অর্জন করেছেন। রাঢ়বঙ্গের ভূ-প্রকৃতির অবদান তারাশঙ্করের শিল্পিমানস ও জীবনদর্শন বিবেচনায় এজন্যেই অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় চিহ্নিত।

পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত ও প্রভাব

সামন্ত-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তারাশঙ্করের অর্জন নয়, বংশগতি সূত্রে অমোঘ প্রাপ্তি। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর উদ্ভব, আশৈশব সে পরিবেশের পরিচর্যায় তাঁর ঐতিহ্যবোধ, সাংস্কৃতিক অভিরুচি এবং শ্রেণী পরিচয়ের আভিজাত্যচেতনা গড়ে উঠেছে। সময়প্রবাহের দ্বন্দ্বময় অগ্রযাত্রায় উত্তরকালে সমকালীন সমাজচৈতন্য-পরিস্রুত তারাশঙ্করের ব্যক্তিচৈতন্য হয়েছে পরিশোধিত-পরিশীলিত। অধীত বিদ্যা, ক্রমবিকশিত সময়স্রোতের প্রভাব, রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্তন এবং এর প্রভাবে জীবনবীক্ষার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অর্জন। যদিও ব্যক্তিগত এই অর্জনের অভিযাত্রায় সমাজমূল সংলগ্ন ঐতিহ্যিক-আদর্শবোধ, শ্রেণী-পরিচয়ের মৌলিক তাৎপর্য, ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের প্রভাব এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলের দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ পরিস্থিতি ও প্রেরণা— উপকরণ-উপাদান-রূপে তাৎপর্যবহ ও দূরসঞ্চারী।

সামন্ত-সমাজের অস্তাচল-যুগে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ঐ-সমাজের শ্রেষ্ঠ অবশেষ—নীতিনিষ্ঠা ও অভিজাত সামন্ত-সংস্কৃতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। সমাজ-পরিবর্তনের ধারায় সামন্তসমাজ-উত্তর ধনতান্ত্রিক- বুর্জোয়া ও গঠনোন্মুখ সমাজতান্ত্রিক সমাজ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। সামন্তসমাজ-ব্যবস্থায় সামন্ত ভূস্বামীর ভূমিবন্টন প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া আধিপত্য সমাজচরিত্রের নিয়ামক হওয়া সত্ত্বেও ঐ-শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায়, আগ্রহে ও অনুশীলনে সংগঠিত সীমাবদ্ধ সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য সমাজের মুষ্টিমেয় সমাজপতির মানস-বৈভবেরই সাক্ষ্যবহ।

তারাশঙ্করের পিতামহ দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় সিউড়িতে ওকালতি পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালীন সামন্ত কুলীন-পরিবারের স্বধর্ম অনুসারে তিনি দার-পরিগ্রহ করেছিলেন তিনবার। তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর একমাত্র এবং 'প্রৌঢ় বয়সের সন্তান'।[১০] শৈশবেই মাতৃহারা এবং অধিক-বয়সের সন্তান হিসেবে হরিদাসের প্রতি পিতার 'স্নেহ দুর্বলতা' ছিল অসীম। মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত হরিদাস পিতার স্নেহাতিশয্যে শৈশবেই অত্যন্ত দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিউড়ি জেলা-স্কুলে সামন্ত আভিজাত্যচেতনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।[১১] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন থেকে স্বেচ্ছাবঞ্চিত অথচ জ্ঞানানুরাগী[১২] হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। একদিকে ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন, অন্যদিকে নবাগত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে ডায়্যারি বা দিনলিপি লেখার অভ্যাস[১৩]— এই দুই বিপরীত ধারার

জীবনযাত্রার সমন্বয়ী প্রকাশও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত। মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃহীন তারাশঙ্কর যদিও 'পিতার সাহচর্য বা শাসনাধীন থেকে প্রতিপালিত হতে পারেন নি, তবু এই আট বছরের সান্নিধ্যেই পিতা পুত্রকে দিয়েছেন তাঁর স্নেহসিক্ত হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ, উজ্জীবিত করেছেন সজীব প্রেরণায়। এ প্রেরণার অনুলেখ আছে ব্যক্তিগত ডায়েরীতে'[১৪] সাহিত্য ও বিদ্যানুরাগী হরিদাস তাঁর ডায়্যারিতে বালকপুত্র তারাশঙ্কর সম্পর্কে আশাবাদ পোষণ ক'রে লিখেছিলেন :' ... অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সঙ্কল্প করিলে তাহা বজায় রাখিবে। ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়— যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকীল হইবে। ... এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে' (১০ : ৪০৮)। উত্তরকালে উকিল না- হলেও স্বদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে তারাশঙ্করের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পিতার এই প্রার্থনা ও প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে।

পিতার সত্যনিষ্ঠা, উচ্চ নৈতিক-আদর্শবোধ, জ্ঞানানুরাগ, স্বদেশপ্রেম এবং দার্শনিকতাযুক্ত কবিত্ববোধ শৈশবে তারাশঙ্করের মানসগঠনে সক্রিয় অবদান রেখেছে।[১৫] হরিদাসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কবিত্ববোধের স্বাক্ষর তাঁর লিখিত ডায়্যারির নিম্নোদ্ধৃত অংশে পরিলক্ষিত :

> রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে পাই—কালরাত্রিরূপা মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়াছিলেন। আজিকার অমাবস্যার অন্ধকার—আমাদের চারিদিকে যেন তেমনি রাত্রির ছায়া ফেলিয়াছে। (১০ : ৪০৯)

আত্ম-সমালোচনার শক্তি, সত্যনিষ্ঠা, 'ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটি চিন্তাকুলতা ও বিষণ্ণতা'র[১৬] গুণ বাল্যাবস্থায়ই তারাশঙ্কর তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। 'হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্পশিক্ষিত হলেও প্রাচীনকালের মনের সঙ্গে নবীনকালের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অসাধারণ তীক্ষ্মবুদ্ধির মানুষ ছিলেন তিনি।'[১৭] হরিদাস তাঁর স্বহস্তলিখিত ডায়্যারিতে নিজের তরুণ বয়সের ব্যভিচারী জীবনের কথা অকপট সারল্যে বিবৃত করে লিখেছিলেন : 'লাভপুরে আসিয়া—লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্পবয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল।' (১০ :

৪২৯) তারাশঙ্করজননী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে এবং স্ত্রীর সঞ্জীবনী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হরিদাস এই 'গ্লানি' থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর *আমার কালের কথা* শীর্ষক শৈশব- জীবনীর গ্রন্থনায় পিতার অপ্রকাশিত ডায়্যারির প্রাসঙ্গিক অংশ প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি। ডায়্যারিতে বিধৃত পিতার রূঢ় আত্মসমালোচনা ও সত্যনিষ্ঠার প্রভাব তারাশঙ্করের সাহিত্যসমগ্রে জীবনবোধের অঙ্গরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ঋণ-স্বীকার ক'রে তারাশঙ্কর লিখেছেন: 'মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকুতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ।' (১০ : ৪৪৮)

বস্তুত, পিতৃপ্রভাব দুই ধারায় তারাশঙ্করের জীবনচৈতন্য সংগঠনে কার্যকর হয়েছে। প্রথমত পিতার 'গম্ভীর ও গভীর তত্ত্ব সন্ধানের আকুতি'র ফলস্বরূপ নীতিনিষ্ঠা ও ধর্মসাধনা, দ্বিতীয়ত স্বদেশানুরাগ ও রাজদ্রোহের মানসিকতা। ব্রিটিশ প্রশাসকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে অনীহা ও প্রথালঙ্ঘনের অপরাধে হরিদাসকে যথেষ্ট অপমানিত হতে হয়। 'দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংলন্ডেশ্বরের প্রতিনিধির আদেশ' মান্য করে প্রকাশ্যে হরিদাসকে স্থানীয় সেটেলমেন্ট ডেপুটির সামনে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। এই অপমান দ্রোহী ক'রে তুলেছিল তাঁকে। যদিও তাঁর এই রাজদ্রোহ অবশেষে 'দেবাদিদেবের'র আশ্যয় প্রার্থনায় প্রশমিত হয়েছে, তবু শিশু তারাশঙ্করের চিত্তে এই দ্রোহই ক্রমশ রাজদ্রোহের স্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তি অনুধাবনীয়: 'বাবা কেঁদেছিলেন দেওঘরে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাত্রে শোবার সময় বিছানায় ব'সে বেশ স্ফুটকণ্ঠেই প্রার্থনা করেছিলেন মনে আছে— রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে? হে দেবাদিদেব! হে আশুতোষ! আমার চোখেও জল এসেছিল। তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এইভাবে সৃষ্টি হ'ল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।' (১০ : ৪৩৫)

জননী প্রভাবতী দেবী, তারাশঙ্করের শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পসাধনায় নিরন্তর প্রেরণা-উৎস। জননীর ব্যক্তিত্ব, রুচি, শিক্ষানুরাগ ও দেশপ্রেম এবং সুস্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তারাশঙ্করের চেতনালোক পরিস্রুত ও সংগঠিত। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী ছিলেন 'পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, বাপ ইংরেজি-নবিস সরকারী চাকুরে।' (১০ : ৪১১) লাভপুরের অচলায়তন সামন্তসমাজে ইংরেজি- নবিস পিতার কন্যা প্রভাবতী নিয়ে এলেন নতুন কালের রুচি, পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা বিস্তার-উত্তর সমন্বয়িত নাগরিক-সংস্কৃতি।[১৮] বধূবেশে পঞ্চদশবর্ষীয়া

প্রভাবতীর পদস্পর্শমাত্র বাড়ির রূপান্তর ঘটলো; মদ্যাসক্ত ও ক্রোধান্ধ হরিদাসের 'সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হল; পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনামগ্ন হলেন।' (১০ : ৪১১) প্রভাবতীর আগমনে শ্রীবর্জিত গৃহ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠলো; নিজের রুচি অনুসারে ঘর পুনর্বিন্যাস করলেন তিনি কেরোসিনের কালি-পড়া ডিবের বদলে মোমবাতির আলো জ্বললো ঘরে।[১৯] এভাবে তারাশঙ্করের পিতৃ-পরিবারে সামন্ত-সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য-রুচি সংমিশ্রিত হলো। তবে, শুধু রুচির দিক থেকে নয়, ভাবের দিক থেকেও নতুন কালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন প্রভাবতী। আত্মজীবনীতে মাতৃপ্রভাব সম্পর্কে তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তি:

> মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পণ ক'রে প্রসন্না শক্তির মত কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্য সত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। এই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, 'আকাশ লোকে বেড়ে চল, সূর্য-আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবনপুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য। (১০ : ৪১৩)

এতদ্ব্যতীত জননীর সাহসিকতা, 'সজাগবোধ' ও সূক্ষ্ম 'পর্যবেক্ষণ শক্তি' আবাল্য আত্মস্থ করেছিলেন তারাশঙ্কর। মাতৃলব্ধ এই গুণ বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে তারাশঙ্করের।[২০]

প্রভাবতী দেবীর বাস্তব দেশপ্রেম তারাশঙ্করকে আজীবন অফুরন্ত প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছে। 'বাস্তব রাজনীতিবোধ তার শুদ্ধমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল ছিল না।' (১০:৪১৯) পাটনার মেয়ে প্রভাবতীর অগ্রজের মধ্যে বিপ্লবী 'মানিকতলা দলের ঢেউ এসে লেগেছিল।' (১০:৪১৯) তারাশঙ্করের আরেক মাতুল (সেজ মামা) পরবর্তীকালে উত্তর-ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্য হয়েছিলেন।[২১] মাতৃপক্ষলব্ধ এই সংস্পর্শ কৈশোরেই তারাশঙ্করের চেতনায় রাজনীতি-চিন্তার বীজ রোপন করেছিল।

একদিকে 'অপমানিত' পিতার রাজদ্রোহী মানসিকতা, অন্যদিকে জননীর সমকাল-পরিস্রুত ও দেশপ্রেম উদ্ভূত রাজনৈতিক সচেনতা—তারাশঙ্করের রাজনৈতিক-বোধির বীজশক্তি-রূপে আশৈশব সক্রিয়। তারাশঙ্কর 'সেকাল ও একালে'র সংক্রান্তি-পর্ব থেকে উত্তরণের মাহেন্দ্রক্ষণরূপে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন) তারিখে বহুবিতর্কিত 'বঙ্গভঙ্গ'-আইন কার্যকর হওয়ার

সময়কে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায় সেকাল ছিলো 'এক জীর্ণমূল বনস্পতির মত। বিস্তীর্ণ শাখায় শাখায় ঘন পত্রপল্লবে পল্লবে ছায়া বিস্তার ক'রে সে বিরাজিত ছিল। তার সর্ব অঙ্গে জীর্ণতা— বহু বজ্রপাতে বহু কোটরের সৃষ্টি হয়েছে বহু শাখা ভেঙে গেছে, ভগ্নশাখার চিহ্নগুলি মহাযোদ্ধার অঙ্গের ক্ষতচিহ্নের মত সম্ভ্রম জাগাত। ... আর জীর্ণমূল বনস্পতি ঝড়ের অপেক্ষা করছে আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে। কখন আসবে ঝড়? ... মাটির তলায় নূতন কালের বীজ তখন ফেটেছে, অঙ্কুর উঠছে, ওই বনস্পতিরই ঝরে পড়া বীজের অঙ্কুর, তারই গোড়ায় সে জন্মাচ্ছে। ঝড়ে চারিদিক বিপর্যস্ত হবে, বর্ষণে মাটি নরম হবে, অতীত কালের বনস্পতি ধরাশায়ী হয়ে আকাশপথ করবে উন্মুক্ত, সেই পথে নূতন কালের অঙ্কুরের আলোক সাধনা হবে শুরু। কখন আসবে ঝড় ?: ... কবে আসবে নূতন দিন?' (১০ : ৪৭৬) ১৯০৫ সালের ৩০ আশ্বিন এল এই নতুন কাল, তারাশঙ্করের ভাষায় 'আমার কালের নূতন কাল। ... বাঙালীর জীবনে— ভারতবর্ষের জীবনে সে একটি মহিমময় দিন। এমন দিন জাতির জীবনে, দেশের ইতিহাসে বহু শত বৎসরে একবার আসে।" (১০ : ৪৭৬) ঐ-দিন স্বদেশী আন্দোলনের আহ্বান বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো লাভপুর গ্রামে। রাখিবন্ধন এবং অরন্ধন কর্মসূচির ঐ- দিনে সাত বছর দু-মাস বয়সী কিশোর তারাশঙ্করের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন জননী প্রভাবতী দেবী।[২২] দেশমন্ত্রে দীক্ষার এই শুভমুহূর্তকে ব্রাহ্মণসন্তান তারাশঙ্কর উত্তরকালে মূল্যায়ন করে লিখেছেন—'সেই আমার উপনয়ন'।[২৩] ব্রাহ্মণপুত্র উপনয়নের মাধ্যমে দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মত্ব লাভ করেন এটাই সনাতন ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু তারাশঙ্কর স্বদেশী- আন্দোলনের সূচনালগ্নে জননীকর্তৃক বেঁধে দেয়া হরিদ্রারঞ্জিত রাখিবন্ধনকে 'উপনয়ন' অভিহিত ক'রে দেশমন্ত্রের দীক্ষাকেই দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভের মূল্য দিলেন। বস্তুত মায়ের এই প্রেরণা ও দীক্ষা আমৃত্যু দেশমন্ত্রে উজ্জীবত রেখেছে তারাশঙ্করকে। *ধাত্রী দেবতা* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ব্যক্তিজননীর 'দেশমাতৃকা'য় উত্তরণের শিল্পরূপায়ণে এই প্রসঙ্গকে উৎসশক্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে পিতা ও জননীর পরই যাঁর প্রভাব আশৈশব তারাশঙ্করের চরিত্রে ও ব্যক্তিজীবনে বিস্তৃত হয়েছে, তিনি, তাঁর পিসিমা; শৈলজা দেবী।[২৪] একই দিনে কলেরায় স্বামী- পুত্র হারিয়ে বাইশ-তেইশ বছর বয়সে পিত্রালয়ে ফিরে এসেছিলেন শৈলজা। তাঁর অন্তরের 'জ্বলন্ত চিতাবহ্নি'র উত্তাপ তারাশঙ্কর-বাৎসল্যে প্রশমিত হয়েছিলো খানিকটা। তারাশঙ্কর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'আমার পিসিমা শৈলজা দেবী আগুনের মত উত্তপ্ত। আমিই ছিলাম সে উত্তাপে জল।'(১০ : ৪৫১) পিসিমা তারাশঙ্করের সেকালের প্রতিনিধি : ক্ষীয়মাণ সামন্ত আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় আমৃত্যু ছিলো তাঁর আকুতি। শৈলজা এবং

প্রভাবতীর 'দ্বৈত অভিভাবকত্বের তথা কর্ত্রীত্বের আওতার আশ্রয়'[২৫] তারাশঙ্করমানসের দ্বৈতস্বভাবকে প্রভাবিত করেছে। পিসিমার কাছ থেকে প্রাপ্ত 'বংশমর্যাদা, অহংবোধ, ঐতিহ্য— অতীত জীবনধারার এই আভিজাত্যের দীক্ষা'—তারাশঙ্কর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কখনো অন্তর্দ্বন্দ্বে কখনো মাতৃলব্ধ আধুনিক জীবনধর্মের সঙ্গে পরস্পর সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে। *ধাত্রী দেবতা* উপন্যাসে জীবনচর্যার এই দ্বন্দ্বময় স্বরূপ অকপট শিল্পসুষমায় বিধৃত করেছেন কথাশিল্পী তারাশঙ্কর। নিতাই বসু তারাশঙ্করের মা-পিসিমা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জীবনের দ্বন্দ্বকে 'কেন্দ্রানুগ' ও 'কেন্দ্রাতিগ শক্তির' মতো বিপ্রতীপ দুই শক্তির দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২৬]

বস্তুত, 'সেকালে'র প্রতিনিধি পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসিমা শৈলজা দেবী এবং 'একালে'র প্রতিভূ জননী প্রভাবতী দেবীর মধ্যকার আদর্শিক দ্বন্দ্ব পরস্পরিত হয়েছে তারাশঙ্কর-চরিত্রে। যে-দ্বিধা তারাশঙ্করের জীবনবীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তার উৎস ঐ- পরস্পরবিরোধী প্রভাবের মধ্যে অনুসন্ধানীয়। 'মা-পিসিমার এই সংঘর্ষ যেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক আদর্শের সঙ্গে প্রাচীন আভিজাত্যপ্রিয় জমিদারী মনোভাবের সংঘর্ষ'।[২৭] যদিও তারাশঙ্কর তাঁর *ধাত্রী দেবতা* উপন্যাসের উপান্তে শিবনাথের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে মা-পিসিমার এই আদর্শিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাণবন্ত রূপকে একটি আদর্শনিষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পুনর্নির্মিত ক'রে শিবনাথ-চরিত্রকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনিরূপিত দেশাত্মবোধের তত্ত্বলোকে উপনীত করেছেন।[২৮] অবশ্য, এতে তারাশঙ্করের দ্বৈধ মানসিকতার অবসান হয়েছে এ-রকম সিদ্ধান্তে পৌছার অবকাশ নেই। এই মীমাংসার পেছনে দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি থেকে দ্বন্দ্বমুক্ত অবস্থায় উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অভিব্যক্ত হয়েছে—দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের স্বধর্ম থেকে তারাশঙ্কর বিচ্যুত হননি।

পিতা ও পিতৃস্বসা তারাশঙ্করের 'সেকালে'র আদর্শ-উৎস, আর একালের জীবনধর্মের প্রতিভূ তাঁর জননী প্রভাবতী।[২৯] গ্রীক দেবতা জেনাসের সম্মুখ ও পশ্চাতের সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মুখ- এর আদলে না হলেও 'সেকাল আর একাল'-এর সন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্বময় প্রতিবেশ এবং এর সপ্রাণ প্রভাবকে তারাশঙ্কর মা-বাবার সম্মিলিত "অর্ধনারীশ্বর মূর্তি'র রূপকে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[৩০] তারাশঙ্কর সেকালের প্রতিনিধি পিতার যে রূপ অঙ্কন করেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায়, সেখানেও পিতৃচরিত্রের স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য অপ্রচ্ছন্ন নয়। পিতা হরিদাস 'সেকালে'র প্রতিনিধি হয়েও পাশ্চাত্ত্য রুচি-প্রভাবিত ডায়্যারি লিখার অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন। অপমানের প্রতিক্রিয়ায় জাগ্রত তাঁর রাজদ্রোহ-দেশপ্রেম অবশেষে ঈশ্বর আশ্রয়ে সমর্পিত। অন্যদিকে নতুন কালের প্রতিভূ হিসেবে অভিহিত জননী প্রভাবতী দেবীও জীবনধর্মে ও বিশ্বাসে স্ববিরোধিতা মুক্ত

নন। তিনি যুগপৎ 'শক্তিরূপা'। লক্ষ্মীর পূজারিণী এবং ইষ্টদেবতা মহাদেব—যিনি বৈরাগ্যের দেবতা—তাঁর সেবিকা। সদর্থক প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> মা আমার মহিমময়ী, কালের নূতন পদপাতে আলপনায় পদশোভা আঁকবার শক্তি এবং নৈপুণ্য নিয়ে জন্মেছিলেন বা অর্জন করেছিলেন ব'লেই তিনি শুধু মহিমময়ী নন। ... যুগভঙ্গিমায় প্রকট কালের মহাকালরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর অসীম। ... পৃথিবীর সম্পদকে, সুখকে তিনি তুচ্ছ বলেন না, লক্ষ্মীকেই তিনি শক্তিরূপা ব'লে থাকেন, পূজাও দেন, প্রণামও করেন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবতা হলেন বৈরাগ্যের দেবতা শিব। (১০ : ৪২০)

জননীর জীবনচর্যার উপর্যুক্ত আত্মবিরোধ তারাশঙ্করের মূল্যায়নে সদর্থকতায় চিহ্নিত। এই দ্বান্দ্বিকতা তারাশঙ্কর চৈতন্যেরও স্বধর্ম এবং পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক এটি মাতৃলব্ধ উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকার তারাশঙ্কর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বাসে-আচরণে-কর্মে সর্বোপরি শিল্পসৃজনে মাত্রা ও গুণগত তারতম্যে আমৃত্যু বহন করেছেন। এ জন্যেই বোধ করি সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার- এর বিবেচনায় 'তারাশঙ্কর : দ্বন্দ্বের শিল্পী, দ্বন্দ্বের শিকার'।[৩১] এ ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর স্বয়ং জননী ও পিতৃসূত্র থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারকে হ্যাঁ-অর্থক অর্জন রূপেই গণ্য করেছেন;[৩২] 'অর্ধনারীশ্বরের রূপকে 'সেকাল আর একালের প্রভাবকে আত্মস্থ ক'রেই তারাশঙ্কর স্বতন্ত্র, দ্বিধাকম্পিত দ্বন্দ্বময় চৈতন্যের সার্থক রূপকার। অনায়াস-অর্জিত এই দ্বন্দ্বময় উত্তরাধিকার তারাশঙ্করের স্বনিরূপিত প্রশান্ত মূল্যায়নে গৌরবময় প্রাপ্তি-রূপে স্বীকৃত :

> অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্তদৃষ্টি শুভ্রবাসপরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। ... ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ ক'রেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সে দিন আমার মাল্য-রচনা সমাপ্ত হবে। বলব, নাও আমার মালা। শেষ ক'রে দিলাম মালা-গাঁথার পালা। আমি হারিয়ে যাই তোমার মধ্যে তোমার জয় হোক— জয় হোক— জয় হোক। (১০ : ৫২০)

পরিবার-উৎস থেকে প্রাপ্ত দ্বন্দময় বিশ্বাসের এই উত্তরাধিকার তারাশঙ্করের ক্রমসংগঠিত চৈতন্যের বিকাশধারায় বীজশক্তি প্রেরণারূপে পূর্বাপর প্রচ্ছন্ন। এই দ্বন্দ্ব বৃহদার্থে ঐ- কালেরই ধর্ম। দ্বন্দ্বময় যুগধর্ম তারাশঙ্করের স্বধর্মে পর্যবসিত হওয়ায় 'সেকাল আর একালে'র দ্বন্দ্বময় শিল্পভাষ্য রচনা করা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছে এবং এ-ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন নিঃসন্দেহে।

ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তবতা

তারাশঙ্কর-জননী প্রভাবতী দেবী 'সেকালের' লাভপুরে হরিদাস-পরিবারে নিয়ে এসেছিলেন 'একাল': অবক্ষয়িত সামন্ত-সংস্কৃতির বর্ণরিক্ততায় তিনি দেশপ্রেম এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির রুচিস্নিগ্ধতার বর্ণলেপন করেছিলেন। গুণগত ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রায় অভিন্ন ভাবেই তারাশঙ্কর-স্ত্রী উমাশশী দেবী তারাশঙ্কর-পরিবারে নিয়ে এলেন বাণিজ্যপুঁজির জাত্যভিমান ও অহঙ্কার। 'শ্বশুরকুল' সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> শ্বশুরকুল আমার কালিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদার ঘরের অর্ধ-শিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে কখনও কয়লা কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারি নি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হই নি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।[৩৩]

উমাশশীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে (১২ মাঘ ১৩২২ বঙ্গাব্দ) তারাশঙ্করের পিতৃমাতৃলব্ধ সামন্ত আভিজাত্য ও সমন্বয়িত পাশ্চাত্ত্য রুচিস্নিগন্ধতার সঙ্গে বাণিজ্যপুঁজির জাত্যভিমান ও অহঙ্কারের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নিজের শান্তি-সুখরহিত বিবাহিত জীবনের জন্য পিসিমা শৈলজা এবং উমাশশীর দিদিমাকে দায়ী ক'রে *কৈশোর-স্মৃতি*-তে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> এই দুটি মহিলাই একদা উদ্যোগী হয়ে... এক খাঁচাতে দুটি পাখি পোষার শখের মতো শখে দুজনকে বেঁধে দিয়েছিলেন।... বিয়ের পরেই শুরু হল এই দুই নারীর অধিকার আর মর্যাদা বোধের ঝগড়া যা পরিণত হল বিচিত্র যুদ্ধপর্বে। ... পিসীমা ছিলেন জীবনে সর্বহারা ... এই সর্বহারা নারীর জীবনে আমিই ছিলাম একমাত্র অবলম্বন, তাই আমাকে হারাতে, আমাকে ছাড়তে, কাউকে আমার মতো বস্তুটিকে হাতে তুলে দিতে তাঁর শক্তি ছিল না। তার চেয়ে মৃত্যু তাঁর ভাল ছিল। ...

আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল। শোনা যায় আগেকার কালে পরিচ্ছদে বিষ মখিয়ে রাজা-বাদশারা অনুগ্রহের ছলে নরহত্যা করতেন। যে হতভাগ্য সেই পোশাক গায়ে দিত তার সারা দেহ বিষাক্ত হয়ে উঠত। আমার জীবনটা তখন ঠিক তাই হয়ে উঠল।৩৪

পরিণত বয়সেও তারাশঙ্কর তাঁর দাম্পত্য-জীবনের সূচনা কালীন পর্বের অশান্তিময় পরিবেশের স্মৃতিচারণায় বেদনাদগ্ধ। প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির ব্যবধান-জাত অচরিতার্থতার সযত্ন-লালিত যন্ত্রণাকে তিনি অকপটে আভরণমুক্ত ক'রে উচ্চারণ করেছেন :

এ নিয়ে জীবনে আর সংগ্রামের শেষ নেই। পত্নী আমার মাথায় খাটো, ছোট মানুষটি, রূপে মনোরমা নন, একথা বলব না। আমার যা রূপ, অর্থাৎ আমি কালো কৃশকায় মানুষটি আয়নায় নিজেকে যতখানি মনোরম মনে করি তিনি তার তুলনায় অনেক বেশি মনোরমা। তবে তাঁর থেকে মনোরমা এ সংসারে অনেক অনেক অনেক। তা নিয়ে আক্ষেপ কখনো হয়নি এমন বলব না, আবার এও বলব না—তার দুঃখেই আমি পাট পাট হয়ে আছি। তবে দেহের ওজনে হাল্কা, ছোট্ট কৃশাঙ্গী মেয়েটি মনের ওজনে অত্যন্ত ভারী, অত্যন্ত শক্ত। তার উপর তাঁর পিতৃকুলের মনোবৃত্তি ও মনের গড়ন আমার মনের গড়ন ও মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার জন্যে যে সংঘর্ষ হয়েছে তার পরিচয় আমার রচনাকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। তবে এর শেষ হয়েছে, কারণ সমাপ্তিতে তিনি জিতেছেন। আশ্চর্যভাবে ধর্মজীবনে এসে সকল অন্যায়, সকল ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন এবং নদের সঙ্গে নদীর মত, আলোর সঙ্গে আলোর মত সুপ্রসন্ন মিলনে মিলে গেছেন। তবুও বিচিত্র কথা এই যে সামান্য কলহে বা মতভেদে বিমর্ষ হয়ে কল্পনা করতে বসি—কখনও গৃহত্যাগের কল্পনা, কখনও বা অতীত সারা জীবনটাকে একেবারে উল্টেপাল্টে, নূতন ভাবে বিচার করি। বার্ধক্যেও তরুণ বয়সের মতো অভিমান করে বসি। তবুও মনে হয় মনের সাতমহলার কোন্ গোপন মহলে কোন্ এক মেয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে, যাকে পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, পাওয়া হয়নি।৩৫

উত্তরজীবনে উমাশশী দেবী শান্ত সমাহিত ধর্মজীবনে নিজেকে সমর্পণ করে শ্রেণীগত আভিজাত্য-চেতনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন সত্য,৩৬ তবু প্রথম জীবনে সম্পত্তিরক্ষা ও সম্পত্তি দখলের জন্য জামাতা ও শ্বশুরকুলের মধ্যকার নীরব সংঘর্ষে৩৭ পিতৃপক্ষের প্রতি তাঁর পরোক্ষ সমর্থন ও ইন্ধন শ্রেণী-স্বভাবেরই অনিবার্য প্রভাব রূপে স্বীকার্য। শ্রেণী অবস্থানের ব্যবধান, সাংস্কৃতিক অভিরুচিগত

পার্থক্য, সর্বোপরি জীবনপ্যাটার্ন ও জীবনবীক্ষার বৈপরীত্য তারাশঙ্কর-উমাশশীর চেতনালোককে সমান্তরাল দুই রেখায় বিভাজন করে রেখেছে। ব্যক্তিগত সংসারজীবনের এই দ্বন্দ্বগূঢ় প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর-চৈতন্যের দ্বিধানির্ভর বৈশিষ্ট্যকেই পরিপুষ্ট করেছে— দুই পরস্পরবিরোধী সমাজস্রোতোধারার যে-সংঘর্ষ তারাশঙ্করের স্বধর্মে অঙ্গীকৃত—সংসারজীবনের এই রূঢ়-বাস্তবতা তারই সম্পূরক উপকরণ। তারাশঙ্কর-উমাশশীর এই অভিরুচিগত সংঘর্ষ ও তার আদর্শনিষ্ঠ মীমাংসার শৈল্পিক ইতিকথা অর্থান্তর না-ঘটিয়ে 'শিবনাথ-গৌরী'র নামান্তরে *ধাত্রী দেবতা* উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

সমাজ-সময় এবং রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের প্রভাব

সমকালীন সমাজ, প্রবহমান সময় এবং রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত শিল্পী তারাশঙ্করের চেতনালোক সংগঠনের এবং স্বতন্ত্র জীবনবিশ্বাস অর্জনে পালন করেছে সহায়ক ভূমিকা। সমাজ-সময় এবং রাজনৈতিক দর্শন ও ঘটনাপ্রবাহ তারাশঙ্করের জীবনার্থে উত্তরণের অন্যতম উদ্দীপনা-উৎস।

অখণ্ড মহাকালে প্রবাহিত অনন্ত সময়গ্রন্থি এবং তারই মধ্যস্থ সমাজের ক্রমবিকাশধারায় চিহ্নিত কালান্তর—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনজিজ্ঞাসার একটি বিশিষ্ট ও প্রিয় প্রসঙ্গ। সমকালের স্বরূপ এবং এক কাল থেকে আরেক কালে উত্তরণের সংক্রান্তিপর্বের বিশিষ্টতা—সঙ্কট-সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব-ঘনীভূত সময়গ্রন্থি তারাশঙ্করের পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও অর্জনের উৎস-শক্তি। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কালান্তরের সময়-সমাজ-রাজনীতির দর্শক হিসেবে এই উপাদান-উৎস থেকে প্রাণিত হয়েছেন জীবনার্থ সন্ধানে এবং অবশেষে ক্রমঅর্জিত এই জীবনার্থকেই উপন্যাসের ঘটনাক্রমে শিল্পগৌরবে দান করেছেন প্রতিষ্ঠা। তাঁর সমাজবোধ, রাজনীতি-ভাবনা ও ধর্মচিন্তা, সমাজ ও সময়প্রবাহের আপাত-অদৃশ্য অথচ অমোঘ পরিচর্যায় পরিস্রুত ও পরিশীলিত।

সময়-পরিস্রুত সমাজ পরিবর্তনেরই অন্য নাম কালান্তর। সমাজ পরিবর্তনশীল—এই পরিবর্তনশীলতা তার কাঠামোয়, প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক মানুষের আচরণে মাত্রাভেদে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত কালশাসিত সমাজের পরিবর্তন অনিবার্য এবং অলঙ্ঘনীয়।[৩৮] আর সমাজসতর্ক ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে স্বকাল এবং স্বসমাজ সম্পর্কে অবগত হওয়া— অন্য কাল ও সমাজ থেকে তার পার্থক্য নিরূপণ ক'রে সমাজসত্যকে উদ্‌ঘাটন করা।[৩৯] তবে কালান্তরের সমাজের যেহেতু গ্রীকদেবতা জেনাসের মত দ্বৈতমুখ— সেজন্যই '... অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ, তার ফলে অভিজ্ঞতার প্রত্যেক ক্ষেত্রে

যে সমন্বয় ও সমাবেশ তার বৈচিত্র্য কখনো বিস্ময়কর, কখনো বিভ্রান্তিকর।'[৪০] কালান্তরের দ্রষ্টা ও শিল্পীরও তাই আশঙ্কা থেকে যায় বিভ্রান্তির। বিশেষত পর্যবেক্ষক-শিল্পী যদি নিজের প্রেক্ষণবিন্দুতে স্বশ্রেণী ও স্বার্থের আসক্তি যুক্ত ক'রে দেন——তাহলে কালান্তরের শিল্পদলিল পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। কোনো কোনো সমালোচক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতিকে তাঁর শ্রেণী-আসক্তির রূপায়ণ ব'লে অভিহিত করেছেন।[৪১] শিল্পীর প্রকৃত জীবনার্থের মানদণ্ডকে পরিহার ক'রে এ -ধরনের মীমাংসায় উপনীত হওয়া সাহিত্যগবেষণার রীতিবিরুদ্ধ। স্মরণ রাখা আবশ্যক, স্বকালের দ্রষ্টা-ঔপন্যাসিক যুগপৎ শিল্পী ও ব্যক্তিমানুষ। ব্যক্তির রুচি ও বিশ্বাস তাঁর দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করবে——এটাই স্বাভাবিক। অন্যভাবে বলা যায়—— কালান্তর-পর্বে অতীতের অংশীদারিত্বে যাঁর গৌরব—— তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি——তাঁর হারানোর যন্ত্রণা মানবিক বলেই বাস্তবিক। তারাশঙ্কর কালান্তরকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এবং তার মাঙ্গলিক আবাহনকে যথাযথ মূল্য দান ক'রেই অস্তমান সূর্যালোকের বেদনাময় বর্ণসুষমার চিত্রপট সৃজন করেছেন।

সামন্ত সমাজের অবক্ষয় এবং নতুন বাণিজ্যপুঁজিনির্ভর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুদয়-উন্মুখ কালান্তর-পর্ব তারাশঙ্করের সমকাল। বাণিজ্যপুঁজি যখন ক্রমশ শিল্পপুঁজিতে স্বরূপ সন্ধান করলো, তখনই সনাতন কৃষিসভ্যতার সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। এই সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কৃষিজীবীর শ্রমজীবীতে রূপান্তর, —— গ্রামীণ শস্যশ্যামল-আরণ্য প্রকৃতির ধ্বংসাবশেষের ওপর কলকারখানা-সমাচ্ছন্ন বস্তিজীবনের বিস্তার। 'প্রশস্তবক্ষ স্বেচ্ছাচারী সামন্তের যুগ অস্তমান, সংকীর্ণচিত্ত হিসেবী যন্ত্রমালিকের যুগ উদীয়মান। বক্ষের এই প্রশস্ততার প্রতি তারাশঙ্কর তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ গোপন করতে পারেননি, হোক সে প্রশস্ততা সেকালের, হোক তা মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারীর চরিত্রসঙ্গী। তার জন্য তাঁকে সেকালপন্থী, অতীতবিলাসী অথবা আধুনিক রাজনীতির আটপৌরে ভাষায় 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।'[৪২] *চৈতালী ঘূর্ণি*, *কালিন্দী*, এবং *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র বেদনাময় শিল্পভাষ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজগতির এই অনিবার্য সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে 'বাস্তবের মাত্রা, কালের মাত্রাই দিয়েছে 'তারাশঙ্করের উপন্যাসকে তার শিল্পিত সামর্থ্য। '[৪৩] যেহেতু শ্রেণী অবস্থানের কারণে তারাশঙ্কর নিজেই ঐ-সমাজদ্বন্দ্বের অংশীদার [৪৪] সেহেতু, 'উপনিবেশের ছত্রছায়ায় গজিয়ে ওঠা বণিক-ধনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিরাগ, অথবা প্রাক্-বুর্জোয়া গ্রাম সম্পর্কে নস্টালজিয়া'[৪৫] থাকা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক; তাঁর শ্রেণী-উত্তরাধিকার থেকেই এই দ্বন্দ্বময় জীবনদৃষ্টি উদ্ভূত।

তারাশঙ্করের সমকালে অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দর্শনের বিস্তার এবং তা বাস্তবায়নের ফলপ্রসূ আন্দোলন। তারাশঙ্কর আশৈশব

রাজদ্রোহী- মানসিকতায় প্রতিপালিত এবং দেশপ্রেম- নির্ভর রাজনীতির যে-ধারা শতাব্দীর সূচনা পর্বে বঙ্গভঙ্গ- আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে সংগঠিত হয়েছিল—তারই প্রেরণায় উজ্জীবিত। শৈশবাবস্থায় চেতনালোকে দেশপ্রেমের যে বীজমন্ত্র উপ্ত হয়েছিল, যৌবনে তা-ই সতর্ক-সজ্ঞান রাজনৈতিক বোধিতে রূপান্তরিত হয়ে তারাশঙ্করের চেতনাবৃক্ষ হয়েছে স্বকাল ও স্বভূমির মৃত্তিকায় প্রোথিতমূল। অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলন সূত্রে তারাশঙ্কর সে-আন্দোলনের সক্রিয় অংশী হয়েছেন। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শন এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনতত্ত্ব পরিণামে তাঁর জীবনদর্শনে আত্তীকৃত হয়েছে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেও দলীয় দর্শন ও গান্ধীতত্ত্ব তারাশঙ্করের জীবনার্থ সন্ধানের পাথেয় হয়েছে সর্বদা। সামাজিক রাজনৈতিক-দার্শনিক ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য, চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগ, উত্তরস্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী প্রশাসনের নৈকট্যলাভ, নির্মোহ সমাজদৃষ্টিকে অক্ষুণ্ন রাখার আন্তরিক প্রয়াস এবং প্রতিনিয়ত দলীয়-রাজনীতির প্রলোভনসাপেক্ষ আহ্বান—ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী উপাদান-উপকরণের মিথষ্ক্রিয়ায় অর্জিত হয়েছে তারাশঙ্করের জীবনার্থ। এবং এই জীবনতত্ত্ব -অন্বেষার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বময়তার অবসান হয়েছে তখনই যখন তারাশঙ্কর অস্তিক্য ধর্মে হয়েছেন আভূমি-আনত।

ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও সান্নিধ্য

ব্যক্তিচৈতন্যের গঠনক্রিয়া যেমন সমাজচৈতন্যের অবারিত প্রভাবশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি দার্শনিক-রাজনৈতিক-সমাজিক- সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও তাঁদের 'ভাবয়িত্রী-কারয়িত্রী' প্রতিভাগুণে সমাজচৈতন্যে যুক্ত করেন নতুন মাত্রা। সমাজগতি ও ব্যক্তিচিন্তার এই মিথষ্ক্রিয়া সামাজিক গতিশীলতারই স্মারক। এ জন্যেই একজন শিল্পীর উদ্ভব ও বিকাশধারায় সমাজগতির প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সঞ্চার করে অন্তগূঢ় প্রেরণা। শিল্পিচৈতন্যের, বিশেষত শিল্পীর জীবনজিজ্ঞাসালব্ধ সত্যলোকে পৌঁছার সংগঠন-স্তরে এই প্রভাব সুদৃঢ়বিদ্ধরূপে থাকে সক্রিয়। কেননা—'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটবিধৃত কোন ব্যক্তির চিন্তনক্রিয়া, অনুভবক্রিয়া ও কর্মক্রিয়ার প্রণালীবদ্ধ রূপ সমাজকাঠামোভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির সংস্পর্শজাত সংবেদনশীলতা দ্বারা বহুলাংশে হয় পরিপুষ্ট, পরিমার্জিত, রূপান্তরিত ও বিকশিত।'[৪৬] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে শৈশবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে পিতা, জননী ও পিতৃস্বসার ব্যক্তিত্ব-আদর্শ-দৃষ্টিকোণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক চেতনাজগৎ সংগঠনে তাৎপর্যবহ প্রভাব রেখেছে। মাত্রাগত তারতম্যে উত্তরাধিকারলব্ধ ঐ প্রভাব-প্রেরণায় আমৃত্যু সন্দীপিত হয়েছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে সমাজ-সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং সংস্পর্শ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনার্থ অন্বেষণে সহায়ক হয়েছে। লক্ষণীয় এই ব্যক্তিমণ্ডলীর প্রত্যেকের চিন্তালোকের স্বকীয়তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চিন্তার বিচিত্র মাত্রা ও বৈপরীত্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে দ্বৈত-স্রোত,—বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আদর্শ ও সংস্পর্শজাত প্রভাবের মধ্যেও সেই বিপরীত স্রোতোধারা পরিলক্ষিত।

সমাজ-ব্যক্তিত্ব

কলিয়ারি-ব্যবসায়ী যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম লাভপুরের নিস্তরঙ্গ জনজীবনে এনেছিলেন সচলতা: তাঁর সূত্রেই বাণিজ্য পুঁজির সচলরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলো লাভপুরবাসী। লাভপুরে সামন্তসংস্কৃতির সঙ্গে বণিকসংস্কৃতির সংঘাতের উৎস তিনিই। যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতায় লাভপুরের 'শ্মশান ভূমির মত পরিত্যক্ত প্রান্তরে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়। 'যাদবলাল বাবুর কীর্তি লাভপুরে অবিস্মরণীয়, তিনিই লাভপুরে নবযুগ-যজ্ঞ-প্রজ্বলনের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, বেদী রচনা করেছিলেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন।' (১০ : ৪৮৯) তারাশঙ্কর উত্তরকালে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান এবং অপরিসীম ঋন-স্বীকার ক'রে লিখেছেন: 'তিনি লাভপুরে আবির্ভূত না হ'লে, এই বর্তমান রচনা [*আমার কালের কথা*] কোনদিনই রচিত হ'ত না। আমি লিখতেই হয়তো শিখতাম না, লাভপুর অন্তত বিশ-ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে থাকত।' (১০ : ৪৮৯-৯০) লাভপুরে নবযুগের অভ্যুদয়-পর্বে যাদবলাল এবং তাঁর পুত্র নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ যাঁরা নবযুগের আবাহনে শরিক হয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশে ঋণস্বীকার ক'রে আবেগময় ভাষায় তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> ... যখনই কাল পরিবর্তনের কথা স্মরণ করি, তখনই আমার কল্পনানেত্রে আমি দেখতে পাই, লাভপুরের পশ্চিমদিকে গেরুয়া রঙের প্রান্তরে বেদী বাঁধা হয়েছে, সমিধ সংগৃহীত হয়েছে, নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে স্বর্গীয় যাদবলালবাবু স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যজমান; যজ্ঞস্থলে বেদীর উপর উত্তরসাধকের বেশে স্থান গ্রহণ করেছেন অবিনাশবাবু। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, স্বর্গীয় নির্মলশিব বাবু, শ্রীযুক্ত নিত্য গোপালবাবু, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্করবাবুরা দল বেঁধে ; ওঁদের পিছনে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। স্বয়ং কাল পুরোহিত।

যজ্ঞ প্রজ্বলিত হ'ল। ঘৃতগন্ধে আকাশ বাতাস ভ'রে উঠল। মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। সব পাল্টে যেতে শুরু হ'ল। দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু হ'ল সব। (১০ : ৪৯০)

এতদ্ব্যতীত সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং প্রথম বাল্যসঙ্গিনী চারু, চারুর কাকা তাঁর প্রথম-শিক্ষক আশুদাদা[৪৭] বাল্যবন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রতুলকৃষ্ণ——এঁদের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ তারাশঙ্করের জীবনের উজ্জ্বল প্রাপ্তি। উত্তরকালে প্রতুলকৃষ্ণের জীবন পর্যবসিত হয়েছে ব্যর্থতায়; লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে তাঁর আত্মীয়তার সম্বন্ধ——দু'জন পরস্পরের ভগ্নিপতি হয়েছেন—— তবে চিন্তা ও কর্মে দূরত্বও স্থাপিত হয়েছে দু'জনের মধ্যে। এঁরা দুজন হলেন দুই দলের কর্মী। আদর্শ নিয়ে মতদ্বৈধতা ঘটল দুজনের——মতাদর্শগত সেই দ্বিধার কিছু বিবরণ বিধৃত হয়েছে *ধাত্রী দেবতার*-র প্রথমাংশে।

দ্বিজপদ——আরেক বাল্যসঙ্গী, তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের অনেকটা জুড়ে যাঁর স্থান। তাঁর *কবি* উপন্যাসের বিপ্রপদ-চরিত্র এই দ্বিজপদ-রই 'অক্ষম রুগ্‌ণ অবস্থার চিত্র' (১০:৫০৪) দ্বিজপদ এবং বন্ধু বড়-পাঁচুর সংস্পর্শ-সান্নিধ্য সূত্রেই শৈশবকালের এক শুভদিনে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের সূচনা। পক্ষীশাবকের মৃত্যুতে পক্ষীমাতার ক্রন্দনকে উপলক্ষ ক'রে পাঁচু- লিখিত দুটি চরণের সম্পূরক চরণ রচনার মাধ্যমেই আট বছরেরও কমবয়সী তারাশঙ্করের সাহিত্যরচনার সূত্রপাত। এই দুই বাল্যসঙ্গীর ঋণস্বীকার সূত্রে তারাশঙ্করের বেদনাময় উচ্চারণ :

> আমরা জীবনে দ্বিজপদ এবং বড় পাঁচু হঠাৎ একদা এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা ক'রে দিলে, সে সূচনা সূত্ররেখার মত সুক্ষ্ম সূত্রপাত থেকে ভবিতব্যের রেখায় মিলে প্রশস্ত হয়ে হ'ল পায়ে-চলা পথ; তারপর পরিণত হ'ল রাজপথে;——অথবা তারা সেইদিন বল্মীক-স্তূপে আরোহণের আস্বাদন দিয়ে আমাকে ভাবীকালে দুরূহ পর্বতাভিযানে রত ক'রে দিয়ে—— নিজেরা নেমে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারে কোন্ মনোরমের হাতছানি তাদের মুগ্ধ করেছিলেন, সেই কথাই আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবি (১০ : ৫০৫)

ধাত্রী দেবতা উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে বিধৃত গোঁসাই বাবা রামজী সাধু, ত্রিকাল ভট্টাচার্য এবং পরিণত বয়সের আলাপী গৌর ঘোষ—— আসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই গল্পকথকত্রয়ের সান্নিধ্যও তারাশঙ্করের জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা।[৪৮]

রাজনৈতিক-ব্যক্তিত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তারাশঙ্করের বড় মামার সঙ্গে পাটনার বিপ্লবীদের ক্ষীণ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিলো।[৪৯] বিপ্লবী নলিনী বাগচীর আদর্শ ও প্রেরণায় তারুণ্যের উন্মেষপর্বে বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু সে-আকর্ষণ থেকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এ-সময়কার মোহ ও মোহমুক্তির ভাষ্য শিবনাথ-চরিত্রের নামান্তরে *ধাত্রীদেবতা* উপন্যাসের প্রথমাংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শৈশব-কৈশোরের সন্ধিলগ্নে তারাশঙ্কর-চিত্তে 'বিপ্লবী বীর' নলিনী বাঁগচী যে-প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন সাহিত্যজীবনের স্মৃতিচারণায় সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> ... এই কিছু কম দুটো বছর [১৯২৯-৩১] আমার মনের অবস্থা দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধার মধ্যে রাজনৈতিক জীবনাবেগটাই ছিল প্রবল। এক সময় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট-অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে লাগিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত করবার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান। সে বহ্নি ছিল পরম পবিত্র। কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। (আ. সা. জী. : ৩৪)

কিন্তু অচিরেই 'বাংলার বিপ্লব ক্ষেত্রে নিদারুণ দুর্যোগ নেমে' আসায় 'বিপ্লবের উদ্যম' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারাশঙ্করের যদিও বিপ্লবী 'দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ'[৫০] হয়নি, তবু 'পুলিশের সতর্কদৃষ্টির সামনে কিছুদিন গৃহবাস করতে হয় তাঁকে।[৫১]

এর কিছুকাল পর করমচাঁদ মোহনদাস গান্ধী আহূত অহিংসঅসহযোগ আন্দোলনের 'আদর্শগত রোমান্টিসিজম (আ. সা. জী. : ৩৪) কল্পনাপ্রিয় তারাশঙ্কর-চিত্তকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে। 'মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা'-র (আ. সা. জী:৩৫) মধ্যেই ছিলো এই আকর্ষণের উৎশক্তি। পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক, মহাত্মা গান্ধীর নীতিনিষ্ঠ এই অহিংসা-তত্ত্বই ক্রমান্বয়ে তারাশঙ্করের জীবনার্থের সারীভূত সত্যে পরিণত হয়েছে। গান্ধীর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য-স্পর্শবঞ্চিত তারাশঙ্কর তাঁর নিজের জীবনে ও শিল্পে, কর্মে ও আদর্শে গান্ধীতত্ত্বের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছেন সর্বাধিক। বলা যায়, গান্ধী-ব্যক্তিত্বই তারাশঙ্করের আদর্শিক ও নীতিনিষ্ঠ সাহিত্যজীবনের প্রেরণাস্থল। পিতৃদেব, জননী এবং পিতৃষ্বসা তাঁর প্রাথমিক

চেতনাজগৎ নির্মাণে সহায়ক হয়েছিলেন। অন্যদিকে সংস্পর্শ-বঞ্চিত গান্ধীব্যক্তিত্বের দূরাগত আদর্শিক প্রভাব-বলয় আমৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেছে তারাশঙ্করের সাহিত্য-শিল্প-জীবন,—বৃহদার্থে জীবনার্থ। তারাশঙ্কর তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসসমূহে গান্ধীতত্ত্বের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন; আত্মজৈবনিক উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়করা তাঁদের কর্মে-সাধনায়, আচরণে -উচ্চারণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম ক'রে ক্রমশ গান্ধীতত্ত্বের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পগ্রন্থ *পৌষলক্ষ্মী*[৫২] (১৯৬০) উৎসর্গ করেছেন মহাত্মা গান্ধীকে। 'উৎসর্গ পত্রে' লেখা আছে— 'মহাত্মা গান্ধীকে/ ২রা অক্টোবর ১৯৪৩"। গান্ধীপ্রভাব তারাশঙ্করের জীবনে এতই দৃঢ়মূল ছিল যে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর নিহত হওয়ার সংবাদে[৫৩] তারাশঙ্কর এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে পরবর্তী নয় বছর কাল পর্যন্ত তিনি আমিষ-খাদ্য বর্জন ক'রে আহার সম্পন্ন করেছেন।[৫৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-র উদ্দেশে। দুইবার স্বল্প সময়ের জন্য সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শ তারাশঙ্করের জীবনাভিজ্ঞতার উজ্জ্বল অর্জন। 'বাঙলার যৌবন শক্তির প্রতীক' এবং 'নবযুগের অগ্রদূত' সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন তারাশঙ্কর।[৫৫] ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে দেশসেবা করার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছেন, তখন বাংলায় কংগ্রেসী রাজনীতির অন্তর্কলহ ছিলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অনেকাংশে উন্মুক্ত। সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত-কে কেন্দ্র ক'রেই এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। এই সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ সংশ্রব না-থাকলেও—তখনো পর্যন্ত তাঁর দলীয় সদস্যপদ অক্ষুণ্ন। ফলে কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতির আভ্যন্তর কোন্দলের মীমাংসায় বীরভূমের সাক্ষী হিসেবে তারাশঙ্করকে সাক্ষ্য দিতে হয়। সুভাষচন্দ্রের অনুগত নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বেই সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে 'অতিথি'-রূপে তাঁর সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পান তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর সেদিন নেতাজীর বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: 'দেখুন, আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসে, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না! আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—চাই—তাই সত্য বলতে সাক্ষী দেব আমি।' (আ. স্মা. জী.: ৫৩-৫৪) সুভাষচন্দ্র তারাশঙ্করের সত্যভাষণ 'অকপটে বিশ্বাস' করেছিলেন এবং বলেছিলেন: '... নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসাবে সেবা করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে।' (আ. সা. জী. : ৫৪) অভিভূত তারাশঙ্কর আত্মহারা হয়েছিলেন—'এই মানুষটির কাছে আত্মসমর্পণ' করেছিলেন 'মনে-মনে' এবং এর

অল্পদিন পর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* উৎসর্গ করেছিলেন তাঁকে।[৫৬] সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন তারাশঙ্কর আকস্মিকভাবেই। তিনি তখন বোলপুরে ক্ষুদ্র-পরিসরে একটি মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ- সময় সরকার বিরোধী প্রচারপত্র মুদ্রণের অভিযোগে উত্থাপিত একটি মামলায় তারাশঙ্কর তিরস্কৃত হয়েছেন— প্রেস চালু রাখতে হলে হয় জামিন নিতে হবে— নতুবা বন্ড দিতে হবে। তারাশঙ্করের এই দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক অবস্থার সময়েই বোলপুর স্টেশনে রবীন্দ্রসন্দর্শন শেষে শান্তিনিকেতন-প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। এই আকস্মিক সাক্ষাৎ-এর অবিস্মরণীয় স্মৃতি ও প্রেরণা প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের বিমুগ্ধ স্বীকৃতি :

> হঠাৎ চোখে পড়ল, সুভাষচন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখ দেখেই বুঝলাম, চিনেছেন—স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে মানুষ বিচরণ করেন, সমগ্র দেশ যাঁর চিন্তার ক্ষেত্র, অতীত থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, স্বপ্নে যিনি বিরাট দেশের ভবিষ্যত রচনা করেন, তাঁর পক্ষে আমার মত অতি সাধারণ চেহারার একজনকে একবার পনের বিশ মিনিট দেখেই কি মনে রাখা—চেনা সম্ভবপর? দেখলাম সম্ভবপর। প্রতিভা—অতিমানবের শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান—তাঁরা তা পারেন।। এই শক্তি দেখেছি রবীন্দ্রনাথের। সে কথা যথাস্থানে বলব। আর আমি বিলম্ব করলাম না। ডাউন প্লাটফর্মে গেলাম, নমস্কার করে দাঁড়ালাম।
>
> তিনি তখন স্মৃতি রোমন্থন ক'রে আমার নাম ঠিক ধরেছেন। বললেন, আপনি তারাশঙ্কর বাবু!
>
> —আজ্ঞে হ্যাঁ
>
> —এখানে ? কি করেন এখানে ?
>
> বললাম সংক্ষেপে—প্রেস করেছি এখানে। তিনি বললেন, ভালো। প্রেস চলছে কেমন?
>
> এবার বললাম, চলছিল কোন রকমে। কিন্তু বুঝতে পারছিনা, বন্ধ করব কি চালাব।
>
> —কেন?
>
> বিবরণ বললাম। তাঁর আশ্চর্য শুভ চোখ দুটি দপ করে যেন জ্বলে উঠল। সে সত্যিই জ্বলে ওঠা। এমন ভাবে চোখ জ্বলে ওঠা আমি আর কারও দেখিনি। তার ছটা আমার চোখে লাগল। উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। বললেন, বন্ধ ক'রে দিন। বন্ডও দেবেন না, জামিনও দেবেন না।

স্থির হয়ে গেল পথ।

প্রেস বন্ধ হল। গরুর গাড়ি ক'রে লাভপুরে এনে ফেললাম। (আ. সা. জী. : ৬১)

—সুভাষ বসুর রাজনৈতিক-দর্শন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠন 'ফরোয়ার্ড ব্লক' এবং সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র কর্মতৎপরতায় অভিব্যক্তি পেয়েছিলো উত্তরকালে। এই পর্বের ঘটনাক্রমকে অবলম্বন ক'রে তারাশঙ্কর লিখেছেন তার বেলাশেষের উপন্যাস *নবদিগন্ত*।

উল্লিখিত ত্রয়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবগুণও মাত্রাগত তারতম্যে তারাশঙ্করের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে—ক্রমসংগঠিত শিল্পিচৈতন্যেও এর সাক্ষ্য বিদ্যমান। তবে রাজনীতিজিজ্ঞাসায় তারাশঙ্করের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা *মন্বন্তর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কালান্তর* প্রভৃতি উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে। সমকালে রুশবিপ্লবের প্রভাবের কথা স্বীকার ক'রেও *চৈতালী ঘূর্ণি* রচনায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব অস্বীকার করেছেন তারাশঙ্কর। আবার শেষজীবনে জীবনের পথ প্রদর্শক-রূপে লেনিনের অবদানের স্বীকৃতিতেও তিনি অকুণ্ঠ।[৫৭] তারাশঙ্কর-চৈতন্যের এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর স্বধর্ম—নিজস্ব দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের তিনি বিশ্বস্ত রূপকার।

সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব

জীবনের কাম্য পথসন্ধানে সমকালীন সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ, সান্নিধ্য, আশ্রয় এবং তাঁদের বিশ্বাসের পরিধি ও প্রভাব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিজীবনের উজ্জ্বল সম্পদ। তাঁর শিল্পিচৈতন্যের ক্রমসংগঠনে প্রেরণায়-সন্দীপনে, ঋজুতা ও দৃঢ়তায় এই প্রভাবপ্রেরণা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ঋণ— যা তাঁর বিশাল সাহিত্যকৃতির অসীম সাফল্য ও স্বীকৃতির অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন।

সাহিত্যজীবনের উন্মেষ-পর্বে স্বগ্রামনিবাসী নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আশীর্বাদ সাধনাক্ষেত্রে তারাশঙ্করের প্রথম পাথেয়। 'তিনিই তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু'। (আ. সা. জী.: ১৫) তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ত্রিপত্র* (১৯২৬) কাব্য উৎসর্গ করেছেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এতদ্ব্যতীত লাভপুরের অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আশীর্বাদও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন তারাশঙ্কর।[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎলাভ এবং আশীর্বাণী তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের অবিস্মরণীয় প্রেরণা ও প্রাপ্তি। তারাশঙ্কর এই ঘটনাকে অভিহিত করেছেন 'কবি-সন্দর্শন'[৫৯] অভিধায়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কারাগার-প্রত্যাগত তারাশঙ্কর যখন

সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে দেশসেবা করার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে সার্বক্ষণিক সাহিত্যজীবন শুরু করেছেন, —তার দু'বছর পর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা বুলু মাত্র ছ'বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। সন্তান হারানোর মানসিক যন্ত্রণায় তারাশঙ্কর যখন বিপর্যস্ত—সে-সময়েই তাঁর ভাগ্যে ঘটলো 'কবি-সন্দর্শন'। শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পল্লি-কর্মী সম্মেলনে লাভপুর সেবাসংঘের প্রতিনিধিরূপে সদ্য কন্যাশোকগ্রস্ত তারাশঙ্কর যোগদান করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে প্রথম সাক্ষাতের মহাকবি-প্রদত্ত উপদেশবাণী উদ্ধৃত ক'রে লিখেছেন :

> কবি আমাদের আশীর্বাদ করলেন, পল্লীর পুনর্গঠনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে বললেন, গ্রামকে গড়ে তোল, নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। (আ.সা.জী. : ৬৮)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটে কবিরই আহ্বানে। সে-সুযোগ এবং তার রেশ তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের পরম পাথেয়। সদ্য প্রকাশিত *রাইকমল*-সহ দুটি গ্রন্থ সঙ্কোচের দুর্বলতা জয় ক'রে রবীন্দ্রনাথের ঠিকানায় রেজিস্টিকৃত ডাকে পাঠিয়ে দেন তারাশঙ্কর। সপ্তাহ পরেই 'র'-অক্ষর লালকালিতে মুদ্রিত খামে রবীন্দ্রনাথের চিঠি এলো। তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> ঠিকানার লেখাও রবীন্দ্রনাথের হাতের; বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল, হাত কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। তখন আমি লাভপুরে রয়েছি। লাভপুর পোস্টাপিসের পূর্বদিকে কল্কেফুলের সারিবন্দী গাছ বেশ কুঞ্জবনের মত ঘন এবং নিরালা। সেই নিরালায় গিয়ে চিঠিখানি খুললাম। পড়লাম, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত হাতে লেখা—
>
> "কল্যাণীয়েষু
>
> আমার পরিচরবর্গ আমার আশে পাশে উপস্থিত না থাকায় তোমার বই দু'খানি আমার হাতেই এসে পৌঁছেছে কিন্তু তাতে পরিতাপের কোন কারণ ঘটেনি। তোমার 'রাইকমল' আমার মনোহরণ করেছে।"
>
> বুক খানা আমার ধড়াস ক'রে উঠল।
>
> 'রাইকমল' মনোহরণ করেছে! আনন্দে উল্লাসে আমার চিত্ত যেন আকাশলোকে সঞ্চরণ ক'রে বেড়িয়েছিল সেদিন।
>
> (আ. সা. জী. : ১১৯-২০)

পত্রোত্তরে তারাশঙ্কর লিখলেন; '*রাইকমল* সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানিনা। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন—স্থূল।' এর ঠিক চারদিন পরই দেখা করার আহ্বানসহ উত্তর এলো রবীন্দ্রনাথের। পত্রের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> তোমার কলমের স্থূলতার অপবাদ কে বা কারা দিয়েছেন জানি না, তবে গল্প লিখতে ব'সে যারা গল্প না- লেখার ভান ক'রে, তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাওনি, এতেই আমি খুশি হয়েছি। (আ. সা. জী. : ১২০)

গল্পের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা এবং সাক্ষাৎ করার আহ্বান-সমেত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি প্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যেই তারাশঙ্কর দ্বিতীয়বারের মত সাক্ষাৎপ্রার্থী হন কবির। তারাশঙ্কর-সম্পর্কে অবিস্মরণীয় মন্তব্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ এই সাক্ষাতেই বলেন :

> তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি। (আ. সা. জী. ; ১২০)

রবীন্দ্রনাথের এই সংস্পর্শ-গৌরব এবং অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাণী তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের পাথেয়, তাঁর শঙ্কামুহূর্তের 'অভয়বাণী'। ঋন-স্বীকার[৬০] ক'রে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ যে উৎসাহ দিলেন, সেই উৎসাহ আমাকে সেই শক্তি দিয়েছিল, যে শক্তিতে ডাক শুনে কেউ সাড়া না দিলেও অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে মানুষ একলা পথ চলতে পারে। এবং এই সময়ে মহাকবির মনের গতিরও আভাস পাওয়া যাবে এই থেকে। সাহিত্যের সঙ্গে দেশের মানুষের যোগস্থাপন করতে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।
>
> মানুষের জীবনের এ উৎসাহের প্রয়োজন আছে।
>
> তন্ত্রসাধনায় শুনেছি, সাধককে 'ভয় নাই'—'মা ভৈঃ' এই কথা শোনাবার জন্য আর একজন সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন হয়। শবাসনে ব'সে সাধক যে মুহূর্তে ভয় পায়, চিত্ত যে মুহূর্তে দুর্বল হয়, সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায় ওই সিদ্ধ সাধকের ওই অভয়বাণী। সাধনায় রত সাধকের সঙ্গে সঙ্গে ভয় দূর হয়, নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী আমার কাছে সেই অভয়বাণী। (আ. সা. জী.: ১৩০)

তারাশঙ্কর তাঁর সুদীর্ঘ শিল্পিজীবনে অসংখ্য সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ লাভ করেছেন। এই সান্নিধ্যসূত্র কখনো হয়ে উঠেছে জীবনপথের পাথেয়শক্তি, অর্জিত জীবনার্থের উপকরণ-উপাদান কিংবা প্রেরণা। ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শজনিত প্রভাব ও প্রেরণার ঋণ তারাশঙ্কর অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। তাঁদেরই উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়েছে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২) তারাশঙ্করের দুর্গম ও বন্ধুর সাহিত্যিক-জীবনের সূচনাকালের প্রথম আশ্রয় এবং 'পরবর্তী জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু'। (আ. সা. জী. : ১৩১) তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা তারাশঙ্করের জীবনের অমূল্য প্রাপ্তি। স্বখরচে ছাপা তাঁর *চৈতালী ঘূর্ণি*-র ফর্মা দেনার দায়ে দফতরি যখন সের-দরে বিক্রি ক'রে দিতে উদ্যত, তখন নিঃশর্তে দেনা পরিশোধ ক'রে সজনীকান্ত গ্রন্থটির প্রকাশক হয়েছিলেন। সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সূত্রপাতও ঘটে সেদিন থেকে।

মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) মূল্যায়ন, আশীর্বাণী, পত্রালাপ এবং স্নেহসান্নিধ্য তারাশঙ্করের 'জীবনসাধনায়' অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে প্রতিনিয়ত। অভয় ও উৎসাহ প্রাপ্তির দিক থেকে তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের পরই মোহিতলালের স্থান। তারাশঙ্করের ভাষায়—'তিনি আমার গুরুদের অন্যতম। আমার জীবন সাধনায় তাঁর কাছ থেকে অহরহ অভয়বাণী পেয়েছি।' (আ. সা. জী.:১৪৩) মোহিতলাল মজুমদারের 'দৃষ্টির গভীরতা', 'ধ্যানযোগের মত সাহিত্যতন্ময়তা', 'জগত ও জীবনব্যাখ্যায় শুচিতা ও অশুচিতার ঊর্ধ্বস্তরের অনুভূতি অথচ তার প্রকাশে জ্যোতির্ময় পবিত্রতার ধারণা' (আ. সা. জী.: ১৪৬) আকৃষ্ট করেছিলো তারাশঙ্করকে। তাঁকে সন্ন্যাসী-রূপে প্রত্যক্ষ ক'রে গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পর্যন্ত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর।[৬১]

তারাশঙ্করের জীবনে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) ওরফে বনফুল-এর স্থান সজনীকান্তের পরেই। তারাশঙ্কর লিখেছেন: 'আমার জীবনে সাহিত্যিক সুহৃদের মধ্যে অন্তরঙ্গতমদের মধ্যে বলাই অন্যতম। সজনীকান্তের পরেই তিনি স্থান জুড়ে বসেছেন। দীর্ঘদিন ধ'রে অনেক প্রীতিনিবেদন নিয়মিতভাবে চলেছে পত্রালাপের মধ্যে। দু-চারবার মতান্তরও ঘটেছে। অনেকদিন নীরবও থাকি দুজনে। আবার একটা ডাক আসে, মনের দুয়ার খোলে।' (আ. সা. জী.: ৬৬)

পূর্বসুরি ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৬৪) সঙ্গে তরাশঙ্করের জীবনদৃষ্টিগত পার্থক্য বিস্তর, শিল্পদৃষ্টিও বিপরীত। কিন্তু সাহিত্যের সামগ্রী চয়নের ক্ষেত্রে নরেশচন্দ্রের কাছে তারাশঙ্কর তাঁর সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করেছেন :

আমার একটি বিশেষ ঋণ আছে নরেশচন্দ্রের কাছে। তাঁর *রাজগীতে* প্রথম পেয়েছিলাম সমাজ ও মানুষের উপর জমিদারী প্রথার ফলাফলের পরিচয়। পরিচয় আমার ছিল, তবে তাকে যে সাহিত্যের মধ্যে গল্প উপন্যাসের অঙ্গীভূত করা যায় তা পেয়েছিলাম তাঁর *রাজগী*র মধ্যে। ... তাঁর থেকেই পেয়েছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে দেশ ও সমাজে ভূমিব্যবস্থা জীবনের সুখ দুঃখ ও মনের গতি ও প্রকৃতির নিয়ামক শক্তিগুলির অন্যতম প্রধান শক্তিশালী নিয়ামক। বাংলার পল্লীর মানুষের প্রেম দয়া মায়া শিক্ষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর ঝুঁটি ধরে এই ভূমিবিধান নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কল্পনা এবং আন্দোলন যাঁরা করেছেন তাঁদের প্রথমদের তিনি একজন। তাঁর *রাজগী* এদিকে প্রথম পদরেখা অঙ্কিত করে গেছে। সেই পথে পরবর্তীকালে আমি হেঁটেছি, সে ঋণ আমার চিরস্মরণীয় ঋণ।[৬২]

রাজগী (১৩৩২, ১৯২৫) প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের এই ঋণস্বীকারের যথার্থতা তাঁর অনেক উপন্যাসেই চিহ্নিত। বিশেষত মহাকাব্যিক উপন্যাস *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় (১৯৬৪-৬৬) জমিদারি-উচ্ছেদ প্রসঙ্গই কথাবস্তুর মৌল ভিত্তি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০)-এর সান্নিধ্যপ্রেরণাও তারাশঙ্করের সাহিত্যিক-জীবনের অনন্য স্মৃতি ও সম্পদ। এতদ্ব্যতীত, সুদীর্ঘ শিল্পিজীবনে অসংখ্য সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে প্রাণিত হয়েছেন তারাশঙ্কর। যাঁদের সংস্পর্শজনিত প্রভাব ও অবদান, শ্রদ্ধা ও স্নেহ সম্পর্কের ঋণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন তারাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন: প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-৭৬), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪), জলধর সেন (১৮৬১-১৯৭৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১); অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), সুবোধ রায় (১৯০৯-৮৫), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), সরোজ রায়চৌধুরী (১৯০৩-৭২), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫), শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-৬৪), যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-৭৬), সমর সেন (১৯১৬-৮৭), সুমথনাথ ঘোষ (১৯০৯-৮৪) গজেন্দ্রকুমার মিত্র (?), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-৮৫), মনোজ বসু (১৯০১-৮৭), শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-৭২), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-৭৫), তুষারকান্তি ঘোষ (?-

১৯৭৪), যতীন্দ্রমোহন দত্ত [য-ম দত্ত] (১৮৯৪-১৯৭৫), রবীন্দ্র মৈত্র•(১৩০৩-৩৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৭০), মধুসূদন মজুমদার (১৯২১-৮১), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৮১), শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৭৭) দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭৫) জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিশ্বাসে ও আচরণে, কর্মপন্থায় ও শিল্পসৃজনে উল্লিখিত ব্যক্তিমণ্ডলীর প্রায় সকলেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। লক্ষণীয়, এঁদের সকলের চিন্তা, কর্ম ও দর্শন কোনো একক স্রোতোপ্রবাহের অধীন নয়। তারাশঙ্কর তাঁর নিজের গ্রহণশক্তির মাধুর্যে এঁদের সংস্পর্শ লাভ করেছেন এবং এর থেকে জীবন -সাধনার প্রয়োজনীয় উপাত্ত-উপকরণ আত্মস্থ করেছেন। আর এ-ভাবেই তারাশঙ্করের জীবনার্থ তথা জীবনদর্শনের সংগঠন- স্তরে উল্লিখিত ব্যক্তিমণ্ডলীর সংস্পর্শ ও প্রভাব পেয়েছে অনিঃশেষ মূল্য ও মর্যাদা।

•

তারাশঙ্করের চিন্তাধারা

সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ও সমকালীন প্রতিবেশ, জন্মস্থানের ভৌগোলিক চারিত্র্য, পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিবার-পরিজনদের প্রেরণা-উদ্দীপনা ও আদর্শ, রাজনীতি-সাহিত্য-সমাজ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য-সংস্পর্শের প্রভাব- জাত জীবনার্থসন্ধানের পাথেয়, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণক্ষমতা, জনসম্পৃক্তি, অধ্যয়ন ও বিচারবোধ, ধর্মবোধ ও সৃষ্টিশীল সংবেদনা তারাশঙ্করকে সামসময়িক বৈরী-সময় প্রবাহের বিপরীতে, আত্মদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সুস্থ ও আশাবাদী জীবনদর্শনে সুস্থিত করেছে। জীবন ও শিল্পসাধনায় অর্জিত এই জীবনার্থের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে তঁর সমাজ-রাজনীতি ভাবনায়, দর্শনচিন্তায় এবং স্বভাবতই এর প্রতিফলন ঘটেছে সৃজিত সাহিত্যের কথাবস্তুতে ও চরিত্ররূপায়ণে।

সমাজচিন্তা

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির ঐশ্বর্যে সময়শাসিত সমাজগতির রূপান্তর ও স্বরূপ সমাজবিজ্ঞানী না- হয়েও আবিষ্কার করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অধীত জ্ঞান থেকে নয়, স্বোপার্জিত সমাজ ও জীবন-দৃষ্টিই সমাজগতির রূপান্তরশীলতার 'তত্ত্বলোকে' উত্তীর্ণ করেছিলো তাঁকে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সামন্ত-সমাজের অবক্ষয় এবং প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের উন্মেষ-পর্বে দুই সংস্কৃতির

আন্তর্সংঘাত, রূপান্তর- বিপর্যয় ও মিথস্ক্রিয়ায় সমাজকাঠামো ও সমাজচৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত পুনর্বিন্যাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারাশঙ্কর। শ্রেণীঅবস্থানের কারণে সপ্রাণ এই সমাজদ্বন্দ্বের অংশীদারও ছিলেন তিনি। ফলে, কখনো-কখনো স্বসমাজের অনিবার্য বিপর্যয় আশঙ্কায় ব্যথিত হয়েছেন তিনি। সামন্ত-সংস্কৃতির গৌরব-ঐশ্বর্যের বিপরীতে নবউন্মেষিত বণিক-সংস্কৃতির প্রাথমিক-পর্যায়ের স্থূল, আভিজাত্য- গৌরববঞ্চিত জীবনচিত্র রূপায়ণে তাঁর শ্রেণীঅবস্থান ও শ্রেণীচরিত্রের পরাভবজনিত বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন। কালান্তরের এই বাস্তবতা তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত ক'রে বাংলা উপন্যাসের পরিধিকে বিস্তৃততর করেছেন। কাল ও কালান্তর তার আভ্যন্তর সংকট ও দ্বন্দ্ব সমেত অবিকৃতরূপেই তারাশঙ্করের সমগ্র-সাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। সমাজ, সময়, কালধর্ম ও কালান্তর প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের চিন্তনক্রিয়া কখনো সামাজবিজ্ঞাসম্মত, আবার কখনো বা এর বিরোধাত্মক ভাববাদী আস্তিক্য ধর্মবোধ দ্বারা প্রভাবিত। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> [ক] এই যে এল নূতন কাল, সে অবশ্য এল আপন বেগে; কালবৈশাখী ঝড়ের মত এল। যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পথে দিলে বাধা, তাদের উড়িয়ে ভেঙে ফেলে ঢেলে দিলে বর্ষণ; আবর্জনার পুঞ্জ মাটির সঙ্গে মিশে পচল, উর্বর ক'রে তুলল দেশকে, নূতন সৃষ্টি সমারোহে চঞ্চল হয়ে উঠল চারিদিকে ঋতুর পর অন্য ঋতু কাল হতে কালান্তর আপনিই আসে। ...অনেক সময় ঋতু অথবা কাল পরিবর্তনের জন্য সাধকেরা সাধনা করে থাকেন। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। সে মহাযজ্ঞের প্রথম সমিধ-সংগ্রহ এবং অগ্নি-প্রজ্বলন হয়েছিল বাংলাদেশেই। ইতিহাসে সে কথা লেখা হবে।[৬৩]

> [খ] ... কারণ ও কর্মে এবং সেই কর্ম ও কারণে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে; রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেই পেয়েছিলাম এই তত্ত্বের সন্ধান। শিখেছিলাম লক্ষ কোটি বৎসর পূর্বে একটি সংঘটনের প্রতিঘাতে ঘটল এক ঘটনা, এবং সে ঘটনার শেষ সেইখানেই হ'ল না; তার জের চলল—আর এক যুগান্তরে। রামায়ণ মহাভারতের মহাবিস্ময়কর রচনা-সার্থকতার মূল তত্ত্বই যেন এইটি।... কৃষ্ণাবতারে কুরুক্ষেত্রের প্রায়শ্চিত্ত জীবনকালেই হয়েছে গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংসে; তাই এর আবির্ভাবে দেখতে পাই এক অভিনব রূপান্তর। দেনা-পাওনা শোধ যেখানে হয় সেখানেই মানবসাধনায় উত্তরকালে বা জন্মান্তরে এক উত্তরণ ঘটে। বুদ্ধাবতারে ঘটেছে তাই। হিংসা থেকে অহিংসা, জ্ঞানযোগ থেকে বোধিতে। (আ.সা. জী. : ৯২-৯৩)

> [গ] চরের উপর কর্মকোলাহল তখনও স্তব্ধ হয় নাই। শেডটার লৌহকঙ্কাল তৈয়ারী

ইহার মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার করোগেটেড শীট পিটানো হইতেছে।...একটা লরির এঞ্জিন কোথায় দুর্দান্তভাবে গর্জন করিতেছে, বোধ হয় কোন দুরন্ত বাধা ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে। মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ স্টীমে বয়লারটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ... অহীন্দ্র নদীর বুকে দাঁড়াইয়া এই অর্ধনির্মিত যন্ত্রপুরীটির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞানকে সে মনে মনে নমস্কার করিল।৬৪

[ঘ] ন্যায়রত্ন কালধর্মকে শিবের তপোবনে ঋতুচক্রের আবর্তনকে ঠেকাইয়া রাখার মত দূরে রাখিয়া সনাতন মহাকাল ধর্মকে আকঁড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলেন—কখন কোন এক মুহূর্তে সেখানে অকাল বসন্তের মত কালধর্ম বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারই ঘরে শশীর মধ্য দিয়া ম্লেচ্ছ বিদ্যার ভাবধারা সনাতন মহাকাল ধর্মকে ক্ষুণ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে।৬৫

[ঙ] সর্বকালের মানুষ বর্তমান নিয়ে অসন্তুষ্ট। বর্তমানকে রদ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ আসে না। ভবিষ্যতের মধ্যেই স্বপ্নরাজ্যের মত রূপায়িত হয়ে আছে জীবনের কল্পনা। কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসে— সে যখন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমানে পরিণত হয়, তখন ভবিষ্যতের কল্পনা স্বপ্নের মতই অলীক হয়ে ওঠে। যে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সে চাইছে, কালের নিষ্ঠুর পদক্ষেপের চেয়েও তা কঠিন—দৃঢ়। কানাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেও একটু হাসলে। সুখময় চক্রবর্তীর পুরনো বাড়িটা অনেক আগে ভেঙে পড়া উচিত ছিল, কত বড় বড় ভূমিকম্প গেছে, এই সেদিনও বয়ে গেল এমন প্রচণ্ড একটা সাইক্লোন—তবু সে বাড়ি ভাঙেনি। কাল ভাঙতে পারে নি, কিন্তু ভাঙবে মারোয়াড়ী মহাজনের ডিক্রী। পুরনো বাড়িখানা ভেঙে ঠিক ওই রকম প্ল্যানেই গড়বে নতুন বাড়ি, যা হবে সুখময় চক্রবর্তীর বাড়ির রূপান্তর।৬৬

[চ] উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতের মিশে গেল।

কাহারেরা এখন নতুন মানুষ। পোশাকে-কথায় -বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্ননপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবাঠাকুরকে ডাকেনা! ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে,—বাতাস-দেখার যন্ত্রটার দিকে।৬৭

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছে সময়গতির এবং কালান্তরের অনিবার্য বিস্তার সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যেমন স্বীকৃত তেমনি আস্তিক্যধর্ম-নিয়ন্ত্রিত অনির্দেশ্য পরমশক্তির প্রভাবও যুগপৎ বিশ্বাসের অঙ্গীভূত। এই দ্বিধা-বৈপরীত্য তারাশঙ্কর-মানসের বিচ্ছিন্নমূল কোন প্রকাশ নয়— অভিজ্ঞতা -ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমবায়ী প্রেরণায় স্বোপার্জিত জীবনধর্ম। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সময়

এবং অগ্রসরমান সমাজকে উল্লিখিত দ্বন্দ্বময় প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন তারাশঙ্কর। ফলত এক-এক উপন্যাসে সমাজগতির বিচিত্র মাত্রা ও রূপ বিভিন্ন সময়ে তাঁর চিত্তাবস্থার ও ভাবনাপুঞ্জের গতিভঙ্গিকে ধারণ ক'রে আছে। অবশ্য উপন্যাসসমূহের পরিণতিতে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সর্বদাই একটি মীমাংসালোকে উপনীত হতে সচেষ্ট। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত এই মীমাংসা কালধর্ম ও কালান্তরের সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিশোধিত।

রাজনীতি-ভাবনা

প্রবহমান সময় এবং পরিবর্তমান সমাজের গর্ভে নব-উন্মোষিত রাজনৈতিক চেতনা, তার বিস্তার ও সাংগঠনিক অভিব্যক্তি—শেষার্ধ উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাংলাদেশের অন্যতম তাৎপর্যবহ প্রসঙ্গ। এই রাজনৈতিক চেতনাধারা সাংগঠনিক ভিত্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত করেছে সমাজচৈতন্য, গড়ে তুলেছে কলোনি-শাসনবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহ।

শৈশবের পারিবারিক পরিমণ্ডল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সহায়ক হয়েছিলো। পিতা ও জননীর স্বদেশানুরাগ, রাজদ্রোহী-মানসিকতা এবং মাতুলপক্ষের বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্রব শৈশব-কৈশোরেই সৃষ্টি করেছিলো তারাশঙ্করের সতর্ক ঔৎসুক্য। পরবর্তীকালে তারুণ্যের গৌরবদৃপ্ত সময়ে সমকালীন বিপ্লবী রাজনৈতিক-ধারার সঙ্গে সামান্য সংযোগও ঘটেছিলো তাঁর। কিন্তু সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্বদেশমুক্তির নেতিবাচক ও নৈরাজ্যসঞ্চারী পথ থেকে অচিরেই সরে এসেছিলেন তিনি। অতঃপর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী-আহূত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিলো তারাশঙ্করের সুস্থ ও ইতিবাচক রাজনৈতিক জীবন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ সূত্রে কারারুদ্ধ হতে হয় তাঁকে। এ-সময়ে বাংলায় কংগ্রেসী-রাজনীতির উপদলীয় কোন্দল ও আর্তসংঘাত দলীয় রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ক'রে তোলে তাঁকে। কারামুক্তির দিনেই তারাশঙ্কর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন—সাহিত্য সাধনার পথ ধরেই হবে তার প্রকৃত স্বদেশসেবা ও স্বদেশসাধনা।

ঘোষণা দিয়ে সক্রিয় দলীয়-রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দীক্ষাচ্যুত হননি তারাশঙ্কর কখনো—আদর্শচালিত রাজনৈতিক-সাহিত্যভুবন থেকে অবসর নেয়া হয়নি তাঁর। বঙ্গভঙ্গ-উত্তর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব-স্মৃতিকে নিজের উপনয়ন বা 'দ্বিতীয় জন্ম' বলে অভিহিত করেছিলেন তারাশঙ্কর উত্তরকালে।

স্বদেশমন্ত্রের সেই সঞ্জীবনী শক্তি শত প্রতিবন্ধকতায়, দেশকাল-সমাজের ভাঙাগড়া ও উর্ত্থানপতনে, ব্যক্তিগত সঙ্কট-দৈন্যে, নিরাশা ও আশায় এবং নবীন প্রত্যয়সমূহের পীড়ন ও দ্বিধায় আমৃত্যু আঁকড়ে থেকেছেন তিনি। জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পুরাণাশ্রয়ী উপমায় তাঁর সেই প্রত্যয়কে সঙ্কেতিত করেছেন এভাবে :

> ... আমাদের পুরাণে আছে স্রষ্টা চর্তুমুখ। চারটি মুখ আমার চোখের সামনেও ভেসে ওঠে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণীমুখ, মহাত্মাগান্ধী ভারতের ধ্যান মুখ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র শৌর্যমুখ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল ভারতের কর্মমুখ। চারটি মুখের ললাটই ত্যাগের তিলকচিহ্নে উজ্জ্বল। প্রত্যেকের কাছেই সত্যের দ্বারা মিথ্যা পরাভূত, হিংসা মিথ্যা, প্রেম সত্য। মৃত্যু পরাভূত, অমৃত করায়ত্ত। প্রতিষ্ঠা রাজাসনে নয়, মানুষের মনোসিংহাসনে। সর্বশেষ সত্য প্রেম অমৃত কর্ম সমস্ত কিছুর একমাত্র আধার মানবধর্ম। এই ধর্মকে আশ্রয় করে ১৯৪৭ সালে যে নবীন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় হয়েছে তার পতাকার প্রতীক ধর্মচক্র, তার আদর্শ বিশ্ব মৈত্রী তার নীতি অহিংসা এবং তার শীল পঞ্চশীল।[৬৮]

বস্তুত, গান্ধীবাদেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রত্যয় সন্ধান করেছেন এবং পরিণামে এতেই নিঃসংশয় আশ্রয় ও স্থিতি লাভ করেছেন তিনি। তবু, দেশকাল-সমাজ-রাজনীতির ভাঙ্গাগড়া, টানাপোড়েন এবং অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য তার প্রত্যয়কেও কখনো প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রত্যয়ের এই পীড়ন তারাশঙ্করের রাজনীতি-ভাবনাকেও কখনো-কখনো করেছে সংশয়াচ্ছন্ন ও দ্বিধাচিহ্নিত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয়তাপন্থীর ও স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসী রাজনীতির উপযোগিতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার। স্বাধীনতা-উত্তর কালে দেউলে রাষ্ট্রধর্মের নামান্তর গান্ধীবাদে তারাশঙ্করের আস্থা এবং কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্য এবং দলের নৈকট্যলাভ সূত্রে কিভাবে তাঁর কাছে বাস্তবতার তত্ত্ব পরাভূত হয়ে দলীয় আইডলজির অধিগত হলো অশ্রুকুমার সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

> পরবর্তীকালের বাস্তবের প্রতি শিল্পীর সততা অক্ষুণ্ন রাখতে গেলে তারাশঙ্করকে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দাঁড়াতে হতো তাঁরই স্বনির্বাচিত রাজনীতির বিরুদ্ধে ১৯৪৭-এর আগে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত হয়েছিল, স্বাধীনতার পরে স্বভাবতই সেই ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম ভেঙে

গেল। সেই মুহূর্তে তারাশঙ্কর তাঁর অবস্থান বেছে নিলেন নবোদিত শাসকবর্গের সান্নিধ্যে। স্বাধীনতার আগে যেমন পরেও তেমনি গান্ধীবাদী, কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় গান্ধীবাদের একটি সদর্থক সক্রিয় রাজনৈতিক তথা সামাজিক ভূমিকা ছিল; স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সেই গান্ধীবাদ দেউলে, গান্ধীবাদ পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ধর্মে— অন্তঃসারশূন্য প্রথার আনুগত্যে যাকে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে হয়। স্বাধীনতার পর পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের দপ্তর ছেড়ে সতীনাথ ভাদুড়ী বেরিয়ে এসেছিলেন, তিনি জেনেছিলেন 'রাজকাজ' ছাড়া কংগ্রেসের আর কিছু করণীয় নেই। ... অথচ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত আগে এবং পরে কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতা দখলের কদর্যতা আরো বহুগুণ কুৎসতিভাবে প্রকাশ পেলেও তিনি দলের কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন; তাদের আইডলজি হয়ে উঠল তাঁর নিজের আইডলজি। ৬৯

অথচ স্বাধীন-ভারতে রচিত *ফরিয়াদ* (১৯৭১) উপন্যাসে তারাশঙ্কর একটি চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও গান্ধীজীর সমালোচনায় 'শাণিত আয়ুধ' হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। উপন্যাসে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষের তিক্ত স্মৃতিচারণায় নামজাদা অ্যাডভোকেট 'সুধাংশুবাবু' ওরফে সুধাংশুমোহন চক্রবর্তী-র অকপট মূল্যায়ন :

শাক দিয়ে মাছ যেমন ঢাকা যায় না— মাছের চেহার দেখা না গেলও যেমন গন্ধে ধরা পড়ে তেমনি ভাবেই একথা আজ প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদের যে ফোড়ং দিয়ে সংবাদব্যঞ্জন পরিবেশন করেন তা থেকে হিন্দুদের তেলকাঁটার গন্ধ ওঠে। একটু চেষ্টা করলেই কাঁটা বেড়িয়ে পড়ে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'র পূজোকে নামে সর্বজনীন করে তুললেও মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এ জাত পায় নি। ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম বলে ভজন গাইলেও অন্তিম সময়ে গান্ধীজী হায় রাম বলেই বিলাপ করেছিলেন। ৭০

বস্তুত চিন্তার এই অস্থিরতা বহুবঙ্কিম জটিলতা-আক্রান্ত ভারতের স্বাধীনতা-উত্তরসময় প্রবাহেরই অনিবার্য অবদান। ৭১ এবং এই অস্থিরতা সার্বিক বিবেচনায় তারাশঙ্কর-মানসের অনড় স্থিতাবস্থা নয়, দ্বিধাচঞ্চল সাময়িক চিত্তবৃত্তি মাত্র।

প্রাক্-তারুণ্যে স্বদেশমন্ত্রে উজ্জীবিত তারাশঙ্কর মাতুলপক্ষের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্তমুগ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসের পথে দেশোদ্ধার যে ইতিবাচক কর্মপন্থা নয়, এটি অনুধাবনে তাঁর অধিক বিলম্ব হয়নি। কিন্তু ইতঃপূর্বে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশের

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব— এই দুটি বৃহৎ ঘটনা সমকালীন তরুণসমাজের কাছে ছিলো এক পরম বিস্ময়। একদিকে যুদ্ধের বীভৎসতা অন্যদিকে এর বিপরীতে সর্বহারা জনগোষ্ঠীর বিজয়ী উত্থান—তরুণ সমাজের কাছে ছিলো এক প্রত্যাশাসঞ্চারী দৃষ্টান্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিভাবনা আলোচনায় রুশবিপ্লবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং মার্কসবাদ- লেনিনবাদের প্রতি তারাশঙ্কর-মানসিকতা সন্ধান করা তাই একান্তই প্রাসঙ্গিক। বিশেষত, এ-প্রসঙ্গে সময়ভেদে তাঁর পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন ও মন্তব্য বিশ্লেষণের সাহায্যে সুসংহত রাজনীতিচেতনায় উত্তরণে তারাশঙ্কর- মানসের দ্বিধা ও দ্বিধামুক্তির স্তরসমূহ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

জমিদারির অভিজ্ঞতা এবং কর্মসূত্রে কলিয়ারির সঙ্গে সম্পৃক্তি— এই দুই 'ভাবনাকে প্রসারিত করার সুযোগ' (আ. সা. জী.: ৫১) পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁর কারাবাস-জীবনে এই 'দুই অভিজ্ঞতাকে জুড়ে '*চৈতালী ঘূর্ণী*-র সৃষ্টি।' (আ. সা. জ.: ৫১) জমিদারির বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তারাশঙ্কর সমাজকে দেখেছেন '... তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু-শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল ব'লেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড ক'রে সরিয়ে সৎকার করতে হবে। চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে এক সঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।' (আ. সা. জী.: ৫০) *চৈতালী ঘূর্ণী* রচনার পটভূমিকায় এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সংঘটিত রুশবিপ্লবের দূরাগত এবং পরোক্ষ প্রভাবের কথাও তারাশঙ্করের ভাষ্যে প্রচ্ছন্ন। *চৈতালী ঘূর্ণি* -উপন্যাসের পটভূমি ব্যাখ্যায় *আমার সাহিত্য জীবন*- গ্রন্থে এক- পৃষ্ঠার ব্যবধানে তিনি মার্কসবাদ ও রুশবিপ্লব প্রসঙ্গে যে মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে স্ববিরোধিতায় চিহ্নিত। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

[ক] সে আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। সেদিক দিয়ে '*চৈতালী ঘূর্ণীর* ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে বলেই মনে হয়। এ নিয়ে অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিট্যাল বা তাঁর লেখা কোন বই আমি পড়ি নি।... কারণ ও কর্মে এবং সেই কর্ম ও কারণে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে; রামায়ন ও মহাভারতের মধ্যেই পেয়েছিলাম এই তত্ত্বের সন্ধান। (আ.সা. জী : ৯২)

[খ] হাজার হাজার বৎসর ধ'রে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল

একদিন আসবেই। এই আমি বুঝছিলাম। উনিশ শো ষোল সতের সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এই টুকু বুঝেছিলাম যে, সে দিন আসতে আর দেরী হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। ... (আ. সে. জী.: ৯৩)

অন্যতর প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর আধুনিক শিক্ষিত ভারতবর্ষের মানসিকতার মূল্যায়নে সিগমন্ড ফ্রয়েড ও কার্ল মার্কস-এর তত্ত্বের প্রভাব এবং এর বিপরীতে ভারতীয় অতীত মানসিকতায় ধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বক্তব্য উপস্থাপনার স্বরভঙ্গিতে ধর্মের প্রতি তাঁর কুণ্ঠাহীন অনুরাগ প্রতিফলিত :

... এ যুগের শিক্ষিত ভারতবর্ষের মন পুরোপুরি ইউরোপের কাছে দীক্ষা নিয়েছে, তাতে বেদ মাত্র দুটি—একটি ফ্রয়েডীয় বেদ, অপরটি মার্ক্সীয় বেদ। একটির কথা হল সবের বীজ কাম, ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো, মার্ক্সবাদের বীজ হল অর্থ বা ওয়েলথ। ধর্ম ছিল এদেশের মূল কথা— সেটাতে ঢেঁড়া দাগ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।[৭২]

স্থানান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারাশঙ্করের রাজনীতিভাবনা তাঁর সদর্থক ভাববাদী আস্তিক্যধর্ম দ্বারা প্রায়শ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন ভারতের অভ্যন্তরীণ শক্তি দু'ভাগে বিভক্ত' '— একটি সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয়। অপরটি যেটি গান্ধীজীর আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয় সেটি অহিংস শক্তি।'[৭৩] প্রথমটির মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন গীতার তত্ত্ব, অন্যটির মধ্যে দেখেছেন বৌদ্ধদর্শন। অধীত জ্ঞানের সাহায্যে তিনি এই বিবেচনায় উপনীত হয়েছেন যে *মহাভারত*-এর কৃষ্ণই 'পরবর্তী অবতারে গৌতম বুদ্ধ হয়ে' আবির্ভূত হয়েছিলেন। ফলত, সশস্ত্র আন্দোলনের শক্তিরূপী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এর মিশন্ যখন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং অবশেষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব যখন অহিংসপন্থীদের অধিগত হয়েছে— তখন তারাশঙ্কর 'ভারত নিয়তির' নির্দিষ্ট ও অমোঘ পরিণতি বলেই একে মনে করেছিলেন।[৭৪] অথচ মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির 'সম্পত্তির সমবন্টন ও শ্রেণীহীন সমাজসৃষ্টি'র[৭৫] তত্ত্ব কখনোই 'অস্বীকার' করেননি তিনি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আচরণ ' 'সমস্ত দেশ' ও 'সমাজে'র মত তারাশঙ্করের চিত্তকেও বিমুখ ক'রে তুলেছিলো। কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত 'এ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যান্ড আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'- এর সঙ্গে তাঁর দু'তিন বৎসরের সংযুক্তিতে তাঁদের 'স্বরূপ দেখে ও বুঝে, হতাশা ও বিতৃষ্ণায় মর্মান্তিক

পীড়ায় পীড়িত' হয়েছিলেন তারাশঙ্কর।[৭৬] আত্মজ সত্যবোধ থেকেই তারাশঙ্কর অনুধাবন করেছিলেন নিজের ভ্রান্তি আত্মসংশোধন এবং নিজের 'শক্তিবলেই তিনি তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বকৃত 'যাত্রাপথে যাত্রা শুরু করতে' পেরেছিলেন।[৭৭] তবু দ্বিধাপীড়িত তারাশঙ্কর চরম-বিচারে এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ না- করে পারেন নি যে—'কমিউনিস্ট পার্টির ভুল বা ভ্রান্তি যাই হয়ে থাক তাতে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য মিথ্যা হয়ে যায় নি। সেদিন এই আদর্শ এবং লক্ষ্যই সাহিত্যের এই ধারার পথে নূতন দিগন্তের ইশারা দিতে পারত।'[৭৮]

উল্লিখিত অন্তর্দ্বন্দ্বময় বক্তব্যের পরেও জীবনসায়েহ্নে *সাপ্তাহিক অমৃত* পত্রিকার ৩ বৈশাখ ১৩৭৭ সংখ্যায় "লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে" শিরোনামার এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তারাশঙ্কর তাঁর জীবনে লেনিন ও গান্ধীর অবদান ও প্রভাব ব্যাখ্যায় এক বিস্ময়কর ও নতুনতর ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন। *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*-গ্রন্থে গবেষক নিতাই বসু অমৃত পত্রিকা থেকে তারাশঙ্কর-ভাষ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। তারাশঙ্করের রাজনীতিভাবনার সূক্ষ্ম রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রসঙ্গটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ বলেই আমরা তাঁর ভাষ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করছি :

[ক] আমি ভারতবর্ষের মানুষ, আমার সম্মুখে একদা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বাণী মানব ভবিষ্যতের কুয়াশাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তা ছিন্ন করে একটি স্থির আলোকোজ্জ্বল পথরেখা যেন মনের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এবং সারাজীবনই আমি আমার জীবনের আচরণের মধ্যে সেই পথ ধরেই চলতে চেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি লেনিনও আছেন। গান্ধীজীর বাণী এসেছিল প্রথম। তারপর এসেছিলেন লেনিন।[৭৯]

[খ] আজ এই মহান মানব প্রেমিক ও মানবেতিহাসের অসামান্য ও অদ্বিতীয় নেতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে সেকালের স্মৃতিকথা স্মরণ করে অকপটেই বলি —১৯১৭ সালে থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জাতীয় জীবনে গান্ধীজির আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত একমাত্র লেনিনই ছিলেন আমার জীবনের নায়ক।[৮০]

[গ] মহান লেনিনের প্রভাবও আমার উপর কম নয়। সত্য বলতে গেলে বলতে হবে— রুশ বিপ্লব এবং মহান লেনিনই সকল মানুষের মুক্তির বার্তা ও পন্থাই আমাকে প্রথম জ্ঞাপন করেছিলেন। ... আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আমার যত মতপার্থক্যই থাক, এই আশ্চর্য মানববন্ধুটি আজও আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আজও তিনি আমার পথপ্রদর্শক।[৮১]

[ঘ] রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের রুশ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা এবং তারই আংশিক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত আমাদের ১৯২১ সালের প্রথম গণ-আন্দোলন আমার চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল।... মহাভারতের 'জনার্দন' একালে, রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালে আমার কাছে শুধু 'জনের'র মূর্তিতেই ধরা দিয়েছিল। তাই আমার সমগ্র চিত্ত সজ্ঞানে এবং আমার অগোচরে সেই সনাতন ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে সেই নিপীড়িত, নিঃস্ব ও তথাকথিত নিম্নদের পরম শ্রদ্ধায় ও সমাদরে নিজের মধ্যে আবাহন করে নিয়ে এসেছিল।[৮২]

গান্ধীজীর আবির্ভাব পূর্বকালে যিনি ছিলেন তাঁর 'জীবনের নায়ক', সেই লেনিনই জীবনের অন্তিমপর্বে পুনরায় অভিহিত হলেন জীবনের পথপ্রদর্শক-রূপে— গান্ধী ও লেনিন উভয়ের মানবতন্ত্র-অভিমুখী লক্ষ্যই তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করেছিলো। কিন্তু মনুষ্যসাধনায় এই দুই কৃতীর কর্ম ও দর্শনের বিপরীত-মুখ পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হয়েও তারাশঙ্কর উভয়ের মূল্যায়নে স্থানবিশেষে নিজের দ্বৈধ-মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। *কালিন্দী*, *মন্বন্তর* এবং *সুতপার তপস্যা*-উপন্যাসে এই দ্বিধাবিজড়িত মানসিকতার অভিব্যক্তি সর্বাধিক।

তবু, শেষ বিচারে তারাশঙ্কর প্রধানত ভাববাদী এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চেতনায় লালিত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ গান্ধীর অহিংসাতত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট। তারাশঙ্করের রাজনীতিভাবনায় যে-দ্বিধা সতত পরিলক্ষিত তা তাঁর রচিত সাহিত্যেও প্রতিফলিত—এবং সাহিত্যের বিষয়বিন্যাস, ঘটনাক্রম এবং আদর্শচালিত পরিণতির মধ্যে এই দ্বিধামুক্তির প্রয়াসও সহজলভ্য। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর নিহত হওয়ার সংবাদে আমিষ বর্জন করে নিরামিষাসী হয়েছিলেন তারাশঙ্কর 'জীবন দেবতা'র আকস্মিক তিরোধানে ড্যায়রির পাতায় লিখিত বন্দনামন্ত্রে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবনাদর্শের পরম কথা সুচিহ্নিত :

মহাত্মাজী অহিংসার বেদীমূলে হিংসায় উন্মত্ত ভ্রান্ত আদর্শবাদীর আক্রমণে আঘাতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। হে শান্ত, হে শুভ্র, হে অনন্তপুণ্যের মূর্ত প্রতীক, তোমাকে প্রণাম।... তোমার ক্ষয় নেই, লয় নেই। অশান্তি ব্যাধিজর্জরিত পৃথিবীতে তুমি শান্তির অমৃত-পাত্র হস্তে ধন্বন্তরীর মত আবির্ভূত হয়েছিলে আমাদের মধ্যে; আমাদের ভ্রান্তি সত্ত্বেও তুমি আমাদের কর্মে আমাদের মর্মে আমাদের ধর্মে অক্ষয় হয়ে অবস্থান কর বুদ্ধের মত। তাঁরই মত সঞ্জীবিত হয়ে ওঠো নিত্য প্রভাতে প্রতি মুহূর্তে।[৮৩]

ধর্মচিন্তা

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তার অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিচারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জগৎ ও জীবন ভাবনায় নির্দ্বন্দ্ব ভাববাদী; আস্তিক্য ধর্মতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর বা আদিকারণ তত্ত্বেই তাঁর প্রত্যয়ের স্থিতি।[৮৪] একদিকে প্রখর বস্তুনিষ্ঠ সমাজবীক্ষা অন্যদিকে সবকিছুর উপান্তে অদৃশ্য অথচ অমোঘ পরমশক্তির লীলাচাপল্য ও অকাট্য বিধান সম্পর্কে অকপট আস্থা— তারাশঙ্কর-চরিত্রের প্রধান ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমাজবীক্ষায় বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হলেও রচনার পরিণতিতে বা মীমাংসায় অন্তরতম ভাববাদই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা প্রচ্ছন্ন থেকেছে। তারাশঙ্কর যে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও শ্রেণীর ধারক, যে রুচি ও চিন্তাচর্চার পরিপোষক এবং সর্বোপরি যে যুগ ও সময়প্রবাহের পথিক তাতে ভাববাদে আত্মনিবেদনই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ও যথার্থ।

তারাশঙ্করের স্বদেশ-সাধনা, রাজনীতিভাবনা, প্রান্তিক বিবেচনায় তার ভাববাদী জীবনদৃষ্টি দ্বারা পরিস্রুত এবং ধর্ম-চিন্তা প্রাণিত। সমাজ ও রাজনীতিভাবনার সঙ্গে ধর্মচিন্তার সমন্বয়ে বীরভূমের সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক অবদান আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।[৮৫] বস্তুত এরই ফলস্বরূপ ধর্মগত নৈকট্য এবং পরস্পরের প্রভাবে যৌথজীবনযাপন প্রণালী রাঢ়ভূমিকে যে অভিনব উদারতা দান করেছে, তা থেকেই তারাশঙ্করের রাজনীতিচিন্তার সঙ্গে সমাজচিন্তা একত্রিত হয়ে মহাজীবনের দিকে তাঁকে আহ্বান করেছে।[৮৬]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারাশঙ্কর কাল ও সময়ভেদে পরস্পরবিরোধী প্রত্যয়ের পীড়নে হয়েছেন দ্বিধান্বিত, অস্থিরচিত্ত। আবার বিশেষ প্রত্যয়ে আস্থা জ্ঞাপন করেও স্বল্পকালের ব্যবধানেই তিনি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এজন্যেই তাঁর ভাবনায়, এবং চিন্তাবাহী রচনায়—বিশেষত, সময়-সমাজ -রাজনীতি -ধর্ম-সমন্বিত রচনায়, বিশেষ করে মহাকাব্যিক আঙ্গিকের উপন্যাসে চিন্তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব- আস্তিক্য-নাস্তিক্য সংঘাত[৮৭] মার্কসীয় জীবনবাদে আস্থা ও অনাস্থা,[৮৮] স্রষ্টা-সৃষ্টি ও ধরিত্রীর অজানিত রহস্যময় অপার শক্তির প্রতি ব্যাকুল বিস্ময় ও আত্মনিবেদন,[৮৯] ভারতীয় দর্শন-অনুসারী মৃত্যুচেতনা,[৯০] এবং পরিশেষে প্রকৃত স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন কুশলী শিল্প-পরিচর্যায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজবোধ ও রাজনীতি ভাবনার সঙ্গে স্বীয় ধর্মচিন্তার সমন্বয়-প্রয়াসী ছিলেন সতত। গান্ধীর অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও ধর্মজীবন-সাধনার প্রয়োজনে গুরুর সন্ধান করেছেন তিনি দীর্ঘদিন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত *রসকলি* গল্পগ্রন্থের সদর্থক সমালোচনার সূত্রে মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তারাশঙ্করের পত্রালাপের সূচনা

হয় এবং ক্রমশ তা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রূপ নেয়। তারাশঙ্কর তাঁর প্রত্যাশিত গুরুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন মোহিতলালের মধ্যে। দীক্ষাগ্রহণের আবেদনও করেছিলেন তারাশঙ্কর— দীক্ষা-বিরোধী মোহিতলাল অবশ্য দার্শনিক-ব্যাখ্যায় তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৯১] এরপর তারাশঙ্কর এক সাগ্নিক তপস্বীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষালাভের আগ্রহ প্রকাশ করলে যোগী সাগ্নিক বলেছিলেন, 'বাবা, সুধা রাখতে হলে হিরন্ময় পাত্র অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয়না।' (আ. সা. জী.: ১৫১) প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি; বিচিত্র দ্বন্দ্বের শেষে অদ্ভুত সন্ন্যাসী 'বুকে টেনে নিয়ে বিচিত্রভাবে' পরাভূত করেছিলেন তারাশঙ্করকে ; ক্ষোভের উপশম হয়েছিল তাঁর। সাগ্নিক তপস্বী বলেছিলেন, জীবন যাঁর সাধনায় অভিষিক্ত, তাঁর গুরু স্বেচ্ছাই আবির্ভূত হন; তারাশঙ্করের জ্ঞানসাধনা তখনই পূর্ণ হবে যখন এর সঙ্গে যুক্ত হবে কর্মের সাধনা।[৯২] অতঃপর অবিমিশ্র সাহিত্যসাধনায় মনোসংযোগ করেছিলেন তারাশঙ্কর।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যু তারাশঙ্করের জীবনপ্যাটার্নের আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছিলো। ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে তিনি মানসিক দ্বন্দ্বের পীড়নে রক্তাক্ত হয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়-পর্ব তারাশঙ্করমানসের দ্বন্দ্বতাড়িত সঙ্কটকাল[৯৩]; একদিকে বিজ্ঞানবাদ, ঈশ্বরের অনস্তিত্বে আস্থা এবং মার্ক্স- এঙ্গেলস্-এর তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ, অন্যপক্ষে আদর্শপন্থী গান্ধীর অহিংসামন্ত্রের প্রতি সুনিবিড় আত্মীয়তার সঙ্গে অন্তর্সংঘর্ষ। অবশ্য, অচিরেই এই সঙ্কটাবর্ত থেকে, চিন্তাকাশ-আচ্ছন্ন সংবর্ত সময় থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন তিনি। মীমাংসিত তারাশঙ্কর এ-পর্যায়ে লিখেছেন; 'ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি ভারতবর্ষ আছে। একটি তীর্থময় ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ, অন্যটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ চলমান ও পরিবর্তনশীল কিন্তু ঈশ্বরমাহাত্ম্যময় এই ভারতবর্ষ সনাতন।'[৯৪] ফলত, পঞ্চাশোর্ধ বয়সে তারাশঙ্কর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিকতায় নিমগ্ন হলেন;[৯৫] দীক্ষা গ্রহণ করলেন (শ্রাবণ ১৩৬১) জননী প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে; প্রশমিত হলো তাঁর দীর্ঘকাল-পরিব্যাপ্ত গুরু-সন্ধানের ব্যাকুলতা।

গণদেবতা - পঞ্চগ্রাম, *আরোগ্য নিকেতন*, *সন্দীপন পাঠশালা*, *উত্তরায়ণ*, *সপ্তপদী* এবং *সুতপার তপস্যা* উপন্যাসে তারাশঙ্করের ধর্মচিন্তার প্রকাশ সুবিস্তৃত। এতে যেমন তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত চৈতন্যের সংশয় পরিস্ফুট, তেমনি এই সংশয়াবস্থা থেকে উত্তরণও সুচিহ্নিত। তারাশঙ্করের সংশয়ী-চিত্তের দ্বিধাবিহ্বলতা সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে *যোগভ্রষ্ট* উপন্যাসে। ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> আজ জগতে এসেছে নাস্তিবাদ। ঈশ্বরবাদ আজ জীর্ণ বৃদ্ধ পিতার শবদেহের মত পড়ে রয়েছে। কোথাও আমরা সর্বময় উত্তরাধিকারী কর্তা বলে চিৎকার করছি। কোথাও মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। শুধু তাই নয়—আজ ওই ঈশ্বরের উপাধানের তলদেশে একটা চিরকুট পেয়েছি। যাতে লেখা আছে—ঈশ্বর চিরকালই এই শবের মত মিশরের মমির মত সাজানো ছিল। জীবন্ত মনে হয়েছিল কিন্তু জীবন্ত কোনকালে ছিল না।। তবে? আমরা কে? আমরা কী? আমরা কেন? জন্তুর পুত্র? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু? আমরা কি শুধু মরবার জন্য এবং যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু ভোগের জন্য ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু— তাকে ভেঙেও মহানাস্তিতে পৌছুতে পারি না। পৌছুই এক মহাশক্তির প্রলয়ঙ্কর প্রকাশে। সে কি অস্তি? না, সে নাস্তি? সেই তো যবনিকা।[৯৬]

অন্যদিকে *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাসে তারাশঙ্করের ধর্মচিন্তা সংহত এবং সংশয় বিমুক্ত। অস্তিবাদ এবং ভারতীয় মৃত্যুতত্ত্ব সমগ্র উপন্যাসের পরিকল্পনায় স্থাপন করেছে ঐক্যসূত্র। আর *বিচারক* উপন্যাসে তারাশঙ্কর ঈশ্বর-অস্তিত্ব নয়, 'ঈশ্বরত্বে'র এক নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠা করলেন। সুরমার পিতা জাস্টিস অবিনাশ চ্যাটার্জীর ভাষ্যে বিধৃত সে তত্ত্ব তারাশঙ্করের অস্তিচেতনারই এক ভিন্ন মাত্রা :

> ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। ব্রহ্ম-টম্ম ও -সবও না। আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, সে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, সেই জন্য আমি ব্রাহ্ম হয়েছি। তবে ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি, সেখানে পৌছুতে চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্র, সব মানুষ করে, সব মানুষ। ওই ঈশ্বরত্ব। একটি পবিত্র মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ।...
>
> ... এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করছে মানব-চৈতন্যের মধ্য দিয়ে। God নন, Godliness, yes Godliness, yes;...
>
> ...গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে।..[৯৭]

বস্তুত এভাবেই তারাশঙ্করের ধর্মচিন্তা ও ঈশ্বরভাবনা মানবকল্যাণকামী 'ঈশ্বরত্বে'র সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম জীবনে গান্ধীর অহিংসামন্ত্রে উজ্জীবিত তারাশঙ্কর যে জীবনার্থ অন্বেষায় সাহিত্যের পথযাত্রায় পথিক হয়েছিলেন— সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় আত্মদ্বন্দ্বের পীড়ন সত্ত্বেও সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি-চিন্তায় পরিশীলিত

হয়ে পরিশেষে তিনি হিংসামুক্ত ও ঈশ্বরত্বময় সমাজ ও মানুষের কল্যাণী তত্ত্বভূমিতে তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবনপ্রত্যয়ের সন্ধান পেয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. '... একদিকে পুরনো প্রতাপ, সমারোহ, আড়ম্বর, অধিকারবোধ, —অন্যদিকে জীর্ণ অতীতের ওপর নতুন অধিকারীর স্থূল হস্তাবলেপ!'
হরপ্রসাদ মিত্র, তারাশঙ্কর, (প্র. প্র. কলকাতা আষাঢ় ১৩৬৮), পৃ. ৩৪

২. আমার কালের কথা [গ্রন্থকারে প্র. প্র. কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৫৮। (১৫ মে, ১৯৫১) তা.র. ১০ ম খণ্ড (১৩৮৮), পৃ. ৪২০। বর্তমান প্রবন্ধে *আমার কালের কথা*-র পাঠ রচনাবলী-র এই সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৩. '...১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালে ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবনযাত্রার শুরু। আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্মমুহূর্তে, সূর্য উদিত হননি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ।
প্রাগুক্ত, পৃ ৪০০

৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ: কলকাতা, ১৯৭১), পৃ. ২৮৩

৫. দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, (৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮০), পৃ. ৫৭৭

৬. দ্র. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃ. ৭৪

৭. বিনয় ঘোষ, "তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ", শনিবারের চিঠি, (সম্পাদক : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস), তারাশঙ্কর সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ২৪৯

৮. এ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্র-র মূল্যায়ন :
'... তাঁর অভিজ্ঞতায় দেশের মাটি মানুষ ও আকাশ সমানভাবে ধরা পড়েছে। সারাজীবন ধরে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেও তাঁর ক্লান্তি নেই, পুঁজি ফুরোয়নি। এত তাঁর সঞ্চয়, এবং বলায় এত তাঁর আনন্দ। রাঢ়ের অকৃত্রিম একনিষ্ঠ শিল্পী: চণ্ডীদাসের পর বাংলা সাহিত্যে রাঢ়ের এত বড় নাগরিক দেখা দেন নি। রাঢ়-ই—তাঁর পৃথিবী, বসুন্ধরা।'

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; উপন্যাসে ও উপকথায় অকৃত্রিম', প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, সম্পাদক : অরুণ সান্যাল, (প্র. প্র. ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১), পৃ. ২৯৫-৯৬ .

৯. দ্র. আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩৫

১০. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

১১. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬-০৭

১২. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৭

১৩. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬-০৭

১৪. সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য , (প্র. প্র. কলকাতা ১৯৮৯), পৃ. ২৭

১৫. দ্র. আমার কালের কথা, পৃ. ৪০৯-১০

১৬. সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; তা.র. ১ম খণ্ড, ১৩৮৬, ভূমিকা—পৃ. ১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৮. 'তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে।' আমার কালের কথা, পৃ. ৪১১

১৯. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

২০. গৃহে সাপের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রভাবতী দেবীর সজাগবোধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের স্মৃতিভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য—প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫-১৬

২১. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

২৩. উদ্ধৃত, তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য; পৃ. ২৯

২৪. শৈলজা ঠাকুরাণী যে তাঁর পিতার বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন তারাশঙ্কর জীবনকথার কোনো স্থানেই সে-কথা উল্লেখ করেন নি। এই তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য "তারাশঙ্করের বংশ তালিকা", আমার পিতা তারাশঙ্কর, সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৪

২৫. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর : ব্যক্তিরূপ, (প্র. প্র., কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ২৩

২৬. দ্র. নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, (প্র. প্র. কলকাতা এপ্রিল ১৯৮৮), পৃ. ১৯

২৭. মুক্তি চৌধুরী; ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর, (প্র. প্র. কলকাতা ১৯৭৭, পৃ. ৬২

২৮. দ্র. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "তারাশঙ্করের উপন্যাসের মাতৃচরিত্র"; শনিবারের চিঠি তারাশঙ্কর সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

২৯. তারাশঙ্কর তাঁর *আগুন* (১৯৩৮) উপন্যাস উৎসর্গ করেছেন 'পিতৃদেবতার চরণোদ্দেশে'। আর 'মা ও পিসীমার শ্রীচরণে' নিবেদন করেছেন উপন্যাস *ধাত্রী দেবতা* (১৯৩৯)।

৩০. দ্র. আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

৩১. দ্র. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, (প্র. প্র. কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮) পৃ. ১১৭-৪৮

৩২. দ্র. আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

৩৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, (প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬০) পৃ. ৫১। *আমার সাহিত্য জীবন* গ্রন্থের পাঠ প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। অতঃপর আ. সা. জী. রূপে গ্রন্থটি উল্লেখ করা হবে।

৩৪. উদ্ধৃত, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

৩৫. উদ্ধৃত, ['কি চেয়েছি —কি পেয়েছি', বেতার ভাষণ, আকাশবাণী) নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উমাশশী দেবীর উদ্দেশে দুটি উপন্যাস *রাইকমল*, (১৯৩৫) ও *পঞ্চপুত্তলী* (১৯৫৬) উৎসর্গ করেছেন।

৩৭. দ্র. শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, পৃ. , তা. র. চতুর্বিংশ খণ্ড, প্রাগুক্ত।

৩৮. 'Social change is the alteration in patterns of social structure, social institutions, and social behavior over time. No society can successfully resist change, not even those that try to do so ...'

Ian Robertson : Sociology, 1980, p. 539

৩৯. 'By the novelist's awareness of the contemporary situation, we mean the novelists sense of the age in which he lives, his intuitive feeling for the stresses and pressures that make it what it is and distinguishes it from other times.

'Walter Allen: The Novel of To-day, 1955.

উদ্ধৃত, হরপ্রসাদ মিত্র; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৪০. হুমায়ুন কবির, "ভারতীয় ঐতিহ্য", চতুরঙ্গ, সংখ্যা ২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ উদ্ধৃত, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসন্ধান, (দ্বি. সং. কলকাতা, সাহিত্য বিহার, ১৯৮৮) পৃ. ৯

৪১. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮০) দ্র. পৃ. ১২০-৫৮

৪২. বিনয় ঘোষ, "তারাশঙ্করের সাহিত্যে ও সামাজিক প্রতিবেশ", শনিবারের চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৪৩. অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৪৪. দ্র. আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত পৃ. ৪০৪

৪৫. প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, "সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস: চৈতালী ঘূর্ণি", এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৮, পৃ. ৮৮

৪৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ, (প্র. প্র., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১) পৃ. ১৫-১৬

৪৭. 'আশুদাদা আমার প্রথম শিক্ষক। দেওঘরে হ'ল হাতেখড়ি; সেইখানেই তিনি শুরু করলেন আমাকে পড়ানো। আশুদাদা ছিলেন ছোটখাটো মানুষটি, মুখে ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী। সাধারণ লোকের কাছে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি বড় সুন্দর মানুষ। ছোটখাটো মানুষ আশুদাদার ব্যক্তিত্ব ছিল আসাধারণ।'

আমার কালের কথা, পৃ. ৪৯১

৪৮. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

৪৯. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

৫০. 'দেশপ্রেমের আবেগটাই বড় ছিল। কোন্ সমিধে যজ্ঞ বিধেয়—যজ্ঞ ডম্বুরে অথবা অশ্বত্থ কাষ্ঠে— এ নিয়ে শাস্ত্রবিধান তখনও আমার বড় হয়ে উঠতে পায় নি। যজ্ঞ- বহ্নিই ছিল বড়, তাকে আত্মহুতিই একমাত্র বিধি ছিল আমার কাছে।'

আমার সাহিত্য জীবন, পৃ. ৩৪

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫২. অগ্রহায়ণ ১৩৫১ -তে প্রকাশিত *১৩৫০*-এ যে চারটি গল্প গ্রথিত হয়.... "পৌষলক্ষ্মী" তার অন্যতম। *১৩৫০* গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে এর নাম পরিবর্তন ক'রে রাখা হয় *পৌষলক্ষ্মী* (১৩৬৭, ১৯৬০)। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা -মতে *১৩৫০* গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৫

৫৩. দ্র. "আমার কথা". শনিবারের চিঠি. তারাশঙ্কর সংখ্যা. প্রাগুক্ত. পৃ. ২১৪
৫৪. দ্র. তারাশঙ্করের শিল্পিমানস. প্রাগুক্ত. পৃ. ৭২
৫৫. দ্র. আমার সাহিত্য জীবন. প্রাগুক্ত. পৃ. ৫১
৫৬. দ্র. প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৪
৫৭. দ্র. তারাশঙ্করের শিল্পিমানস. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৩৭-৩৮
৫৮. দ্র. আমার সাহিত্য জীবন. পৃ. ৮
৫৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭
৬০. তারাশঙ্কর তাঁর *রসকলি* (১৩৪৫) গল্পগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। উৎসর্গ পত্রটি নিম্নরূপ- "কবিগুরু/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীচরণেষু/২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫"।
৬১. দ্র. আমার সাহিত্য জীবন. পৃ. ১৪৩-৪৪
৬২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়. (একটি নাম : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; অমৃত. ৯ আশ্বিন. ১৩৭১. পৃ. ৫৮৮-৮৯) উদ্ধৃত : স্বস্তি মণ্ডল. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (জীবনীগ্রন্থমালা): (প্র. প্র. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী.নভেম্বর ১৯৯২). পৃ.২১
৬৩. আমার কালের কথা. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৮৮-৮৯
৬৪. *কালিন্দী:* তা.র. দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৯৪). পৃ. ১৭১-৭২
৬৪. *পঞ্চগ্রাম:* তা.র. চতুর্থ খণ্ড (১৩৯৭). পৃ. ২২
৬৬ *মন্বন্তর:* তা.র. পঞ্চম খণ্ড (১৩৯১). পৃ. ২০০
৬৭. *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*. তা.র. সপ্তম খণ্ড (১৩৮৯). পৃ. ৪৭৩
৬৮. উদ্ধৃত. তারাশঙ্করের শিল্পিমানস. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৩৬-৩৭
৬৯. অশ্রুকুমার সিকদার. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস. পৃ. ১৪৫-৪৬
৭০. ফরিয়াদ. তা. র. বিংশ খণ্ড. প্র. প্র. ১৩৮৯. পৃ. ১৬
৭১. স্বাধীনতাউত্তর ভারতের নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে তারাশঙ্করের বিশ্বাস ও অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতা এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে গান্ধীবাদের অন্তসারশূন্যতা প্রসঙ্গে বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য---উপন্যাস নিয়ে: দেবেশ রায়. দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা. পৃ. ৯৯-১০০
৭২. "মনের আয়নায় নিজের ছবি". তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়. শনিবারের চিঠি. পৌষ ১৩৬৯. পৃ. ১৮৩। উদ্ধৃত : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি. নাজমা জেসমিন চৌধুরী. পৃ. ১৫৭
৭৩. 'আমার কথা'. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়. শনিবারের চিঠি. শ্রাবণ ১৩৭১. পৃ. ৩১০

৭৪. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৭৬. দ্র. 'আমার কথা', শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ২১৩
৭৭. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩-১৪
৭৯. উদ্ধৃত : তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, প্রাগুক্ত: পৃ. ২৩৮
৮০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
৮১. প্রাগুক্ত,
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-৩৯
৮৩. 'আমার কথা', শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ২১৪
৮৪. দ্র. ভূমিকা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তা. র. প্রথম খণ্ড
৮৫. উদ্ধৃত ভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, সমরেশ মজুমদার, (প্র. প্র., কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৬৮), পৃ. ১৬৮।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৮৭. দ্র. *যোগভ্রষ্ট*, তা, র. ষষ্ঠ খণ্ড, দ্র. ভূমিকা, পৃ. ১ । ।, তা. র. চতুর্বিংশ খণ্ড
৮৮. দ্র. উপন্যাস *কালিন্দী, যোগভ্রষ্ট, মন্বন্তর, ঝড় ও ঝরাপাতা, সুতপার তপস্যা।*
৮৯. দ্র. *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, সন্দীপন পাঠশালা, আরোগ্য নিকেতন, উত্তরায়ণ, সপ্তপদী।*
৯০. দ্র. *আরোগ্যনিকেতন*
৯১. দ্র. আমার সাহিত্য জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৯২. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-৫১
৯৩. দ্র. তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৯৫. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৯৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: "কয়েকটি কথা" : যোগভ্রষ্ট, তা. র. ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮
৯৭. বিচারক, তা. র. দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ১৯৫-৯৬